শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রথমপ্রকাশ : কার্ত্তিক ১৩৫৪
দ্বিতীয় প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬০

ডি, এম্, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত
শ্যামসুন্দর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

বাড়ীতে কেউ নেই। ডিস্‌পেনসারির কাজ সেরে এইমাত্র বাজার থেকে ফিরে এসেছি।

পাড়ার সনাতন চক্কত্তি বাইরের বৈঠকখানায় বসে আছে।

বললাম—কি সনাতনদা, খবর কি?

সনাতন উত্তর দিল—এমনি করে শরীরটা নষ্ট কোরো না। বেলা একটা বেজে গিয়েছে। এখনও খাওয়া-দাওয়া করনি?

সনাতনের কথা শুনে হাসলাম একটুখানি। আমি জানি, সনাতন আমার মন যোগাবার জন্যে একথা বলছে। সে ভালই জানে, আমার কেন দেরি হয় ডিস্‌পেনসারি থেকে উঠে আসতে। সকাল থেকে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাই কখন?

বললাম—রুগীর ভিড় জানো তো কেমন?

সনাতন মুখখানাতে হাসি এনে উজ্জ্বল করবার চেষ্টা করে বললে—তা আর জানি নে? তোমার মত ডাক্তার এ দিগরে ক'টা আছে? ওষুধের শিশি ধোওয়া জল খেলে রোগ সেরে যায়—

চা খাবে সনাতনদা?

ন: —পাগল? এখন চা খাবার সময়?

ত: —তা হোক, চলুক একটু।

আমার নিজেরও এখন তাড়াতাড়ি স্নানাহার করবার ইচ্ছে নেই। সনাতনের সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে একটু আড্ডা দেওয়া যাক। ডিস্‌পেনসারির চাকর বুধো গোয়ালা চাবি নিয়ে সঙ্গে এসেছিল, তাকে বললাম, তোর মাকে বল গিয়ে দু' পেয়ালা চা করে দিতে।

সনাতন চক্কোত্তি গ্রামের গেজেট। সে কেন এখানে এসেছে এত বেলায় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

চা খেতে খেতে সনাতন বললে—আবদুল ডাক্তারের পসার —বুঝলে ভায়া—

হাসি হাসি মুখে সে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম—ব্যাপার কি?

—আর কি ব্যাপার—একেবারে মাটি!

—কে বললে তোমাকে?

—আমি বলছি। আমি জানি যে—

—কেন, সে তো ভাল ডাক্তার—

—রামোঃ, তোমার কাছে? বলে সেই 'চাঁদে আর কিসে'! হোমিওপ্যাথির জল কে খাবে তোমার ওষুধ ছেড়ে। বলে ডাকলে কথা কয়। রামু তাঁতীর বউটার কি ছিল? হিম হয়ে গিয়েছিল তো। তুমি গা ফুঁড়ে না ওষুধ দিলে এতদিনে দোগেছের শ্মশান-সই হোতে হোত।

নিজের প্রশংসা শুনতে খারাপ লাগে না, তা যেই করুক, তবুও আমি অন্য একজন ডাক্তারের নিন্দাবাদ আমার সামনে হোতে দিতে পারি না। আমাদের ব্যবসার কতকগুলো নীতি

আছে, সেগুলো মেনে চলাতেই প্রকৃত ভদ্রতা। বললাম—ডাক্তার রহিমকে যা-তা ভেবো না। উনি খুব ভাল চিকিৎসা করেন—অবিশ্যি আমি নিজে হয়তো হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিনে, কিন্তু—

সনাতন হাত নেড়ে বললে—না রে ভায়া, তুমি যাই বলো, তোমার কাছে কেউ লাগে না। একবার সাইনবোর্ডটা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—ডাক্তার বি. সি. মুখার্জি এম. বি. মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব হাউস সার্জ্জন—সোনার পদক প্রাপ্ত—

—তুমি বোসো দাদা, আমি খেয়ে নিই—

—বিলক্ষণ। নিশ্চয়ই নেবে। তুমি যাও ভেতরে, আমি এই তক্তাপোশে একটু ঘুম দিই।

—বাড়ীতে কেউ নেই। তোমার বউমা গিয়েছেন রাজু গোঁসাইয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। কি একটা মেয়েলি ব্রত উদযাপন। সেই জন্যেই তো এত দেরি করলাম।

একটু পরে স্নান সেরে উঠেছি, গৃহিণী বাড়ী এলেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। সঙ্গে রাজু গোঁসাইদের বাড়ীর ঝি, তার হাতে একটা পুঁটুলি।

আমায় দেখে সুরবালা বললে—কি গো, এখনও খাওনি?

—কই আর খেলাম।

—দাঁড়াও ভাত এনে দিই, লক্ষ্মী জায়গা করে দে—

—খুব খাওয়ালে রাজু গোঁসাইয়েরা? কিসের ব্রত ছিল?

—এয়োসংক্রান্তির ব্রত। তোমার জন্যে খাবার দিয়েছে—

—আমার জন্যে কেন? আমি কি ওদের এয়ো?

—তা নয় গো। তুমি গাঁয়ের ডাক্তার, ডাক্তারকে হাতে রাখতে সবাই চেষ্টা করে।

—না না, ও আমি ভাল বাসি নে। লোকের অযথা ব্যয় করিয়ে দিতে চাইনে আমি। ও আনা তোমার উচিত হয়নি।

—আহা! কথার ছিরি ছ্যাখো না। আমি বুঝি ছাঁদা বেঁধে আনতে গিয়েছিলাম—ওরা তো পাঠিয়ে দিলে ঝি দিয়ে।

পৈতৃক আমলের দোতলা কোঠা বাড়ী। আহারাদি সেরে পূবদিকের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম। বড় পালঙ্কখাটে পুরু গদি তোশক পাতা ভাল বিছানা। সুরবালার নিজের হাতের সুচের কাজের বালিশ-ঢাকা, বালিশের-ওয়াড়। খাটের ঝালরও ওর নিজের হাতের। এই একটা বিষয়ে আমার শৌখিনতা আছে স্বীকার করছি, ভালো বিছানা না হোলে ঘুম হবে না কিছুতেই। তা ছাড়া, ময়লা কোনো জিনিস আমি দেখতে পারিনে, দশদিন অন্তর মশারি ধোপার বাড়ী দিতে হবেই। আমার এক রোগীর বাড়ী থেকে পুরনো দামে একখানা বড় আয়না কিনেছিলাম, ওপাশের দেওয়ালে সেটা বসানো, সুর-বালার শখের ড্রেসিং টেবিল পালঙ্কের বাঁ ধারে, তিনখানা নতুন বেতের চেয়ার এবার ক'লকাতা থেকে আনিয়েছি সুরবালার ফরমাশ-মত খান আষ্টেক বৌবাজার স্টুডিওর ছবি—কালীয় দমন, রাসলীলা অন্নপূর্ণার শিবকে ভিক্ষাদান, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী, শ্রীশ্রীসরস্বতী, ইত্যাদি। আমার পছন্দসই আছে একখানা বিলিতি ল্যাণ্ডস্কেপ—সেও ওই বৌবাজারের দোকানেই কেনা

জানালার গায়ে জামরুলগাছের ডালটা এসে ছুয়ে পড়েছে, তার পেছনেই জাওয়া বাঁশের ঝাড়। শীতের বেলা, এর মধ্যেই বাগানের আমতলায় মুচুকুন্দ চাঁপা গাছটার তলায় ছায়া পড়ে এসেছে, ছাতারে পাখীর দল জামরুল গাছটার ডালে কিচ্‌কিচ্‌ করছে—বাগানের সুদূর পাড়ের ঘাসের জমিতে আমাদের বাড়ীর গরু ক'টা চরে বেড়াচ্ছে।

সুরবালা পানের ডিবে হাতে এসে বললে—একটু ঘুমিয়ে নাও না।

—বাইরে সনাতন চক্কত্তিকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

—সে মিন্সের কি যাবার যায়গা নেই, এখানে এসে জুটেছে কেন দুপুরে।

—ঘুমুচ্ছে।

—তবে তুমিও ঘুমোও।

সুরবালাকে বেশিক্ষণ দেখতে পাইনে দিনের মধ্যে, খোকা-খুকিদেরও না। বললাম—বোসো আমার কাছে, আবার হয়তো এখুনি বেরুতে হবে। একটু গল্পগুজব করি।

সুরবালা বালিশে হাত রেখে বসলো পাশেই। বললে—আজ আর বেরিও না—এত বেলায় এলে—

পাশের গাঁয়ে একটা শক্ত রুগী রয়েছে, তার কথাই ভাবছি—

—যেতে হবে? কল্‌ না দিলেও?

—আমি তাই তো যাই। ফি নিইনে নিজে গেলে। তুমি তো জানো।

গরুর গাড়ীতে চলে না। তোমার শরীরের কষ্ট বড় বেশি হয়।

—দেখি একখানা মোটর কিনবার চেষ্টায় আছি! কলকাতায় গেলে এবার দেখবো।

সুরবালা আবদারের সুরে বললে—হ্যাগা, নিয়ে এসো কিনে একখানা—আমাদের একটু চড়ে বেড়াবার ইচ্ছে। আনবে এবার ?

—কাঁচা রাস্তা যে! বর্ষাকালে—

—কেন, তোমার ডিস্‌পেনসারিতে রেখে দেবে বর্ষাকালে। বাজারে তো পাকা রাস্তা।

—তোমার ইচ্ছে ?

খু-উ-ব। জয়রাজপুরের মল্লিক বাড়ীতে তাহোলে দুর্গা-পূজোয় মোটর চড়ে নেমন্তন্ন খেতে যাই এ বছর।

—এ বছর কি রকম ? সামনের বছর বল—

—ঐ হোল। খুনুকে টুনুকে বেশ করে সাজিয়ে মোটরে উঠিয়ে—

—না না ওদের মাথায় ওসব ঢুকিও না এ বয়সে। ওদের কিছু বলার দরকার নেই।

—আহা! আমি যেন বলতে যাচ্ছি! তুমি বললে, তাই বললাম।

—বেশ দেখছি আমি। তোমার হাতে কত আছে ?

—গুণে দেখিনি। হাজার চারেক হবে। তুমি কিছু দিও —কিনতে হয় ভাল দেখে একখানা—

—ওতেই ভেসে যাবে।

আমি সামান্য একটু ঘুমিয়ে নিই।

যখন উঠলাম তখন শীতের বেলা একেবারেই গিয়েছে। সুরবালা চা নিয়ে এল। বললাম, বাইরে সনাতনদা বসে আছে নিশ্চয়। ওকে চা পাঠিয়ে দাও—

সুরবালা বললে—মালিয়াড়া থেকে তোমার কল্ এসেছে, দু'জন লোক বসে আছে। বৃন্দাবন কম্পাউণ্ডার এসেছিল বলতে, আমি বললাম বাবু ঘুমুচ্ছেন।

—এখন আমার ইচ্ছে নেই যাবার।

—সে তুমি বোঝো গিয়ে। কিছু খাবে ?

—নাঃ, এই অবেলার শেষে খিদে নেই এখন। জামাটা দাও, নিচে নামি।

বাইরের ঘরে সনাতনদা ঠিক বসে আছে। আমায় বললে—কি হে, ঘুমুলে যে খুব ? এরা এসেছে মালিয়াড়া থেকে তোমায় নিতে।

লোক দুটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। একজন বললে —এখুনি চলুন ডাক্তারবাবু, বীরেশ্বর কুণ্ডুর ছোট ছেলের জ্বর আজ ন'দিন। ছাড়ছে না কিছুতেই—

—কে দেখছে ?

—গ্রামেরই শিবু ডাক্তার—

—বসুন। পঞ্চাশ টাকা নেবো এই অবেলায় যাওয়ার দরুণ—

—বাবু, আপনার দয়ার শরীর। অত টাকা দেওয়ার সাধ্যি থাকলে শিবু ডাক্তারকে দেখাতে যাবো কেন বলুন।

—কত দিতে পারবেন? দশ টাকা কম দেবেন—

সনাতনদা এই সময় বলে উঠলো—দরদস্তুর করাটা কার সঙ্গে? উনি হাত বুলিয়ে দিলে রুগীর অসুখ সেরে যায়—কোনো কথা বোলো না।

সনাতনের ওপর আমি মনে মনে বিরক্ত হোলাম। আমি তাকে দালালি করতে ডেকেছি নাকি? ও রকম ব্য[illegible] কথা বলা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। সনাতনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশের জন্যেই বললাম—দরদস্তুর আমি পছন্দ করিনে বটে, তবে গরীব লোকের কথা স্বতন্ত্র। যাগ গে, আর দশ টাকা কম দেবেন। কিসে যাবো? নৌকো এনেছেন? বেশ।

সনাতন আমার সঙ্গে নৌকোতে উঠলো।

রাঙা রোদ নদীতীরের গাছপালার মাথায়; সাদা বকের দল শেওলার দামে, ডাঙার সবুজ ঘাসে চরে বেড়াচ্ছে, শীত আজ ভালই পড়েছে। উপীন জেলে নদীর ধারে দোয়াড়িতে মাছ ধরছে, আমায় দেখে বললে—বাবু, একটা বড় বাটা মাছ প্যালোম এই মাত্তর—আপনার বাড়ী পেটিয়ে দেবো?

সনাতন বললে—কত বড় রে?

—তা দেড় সের সাত পোয়ার কম হবে না, আন্দাজে বলছি। এখানে তো দাঁড়িপাল্লা নেই।

বাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দিবিনে তো ব্যাটা কোথায় দিবি? এই অবেলায় সাতপোয়া মাছ নিয়ে দাম দেবার খ্যামতা আছে ক'জনের এ গাঁয়ে? দে পাঠিয়ে দে।

আমি মৃদু বিরক্তি জানিয়ে বললাম—কি ওসব বাজে কথা বকো ওর সঙ্গে সনাতনদা। মাছ দিতে বললে, অত কথার দরকার কি?

সনাতন অপ্রতিভ হবার লোক নয়, চড়াগলায় বললে—কেন, অন্যায় অন্যায্য কথা নেই আমার কাছে। ঠিকই বলেছি ভায়া। তুমি ছাড়া নগদ পয়সা ফেলবার লোক কে আছে গাঁয়ে? আসল লোকই তো তুমি—

রোগীর বাড়ীতে গ্রামের বৃদ্ধলোকেরা জুটেছে। শিবু ডাক্তারও ছিল। শিবু ডাক্তার সেকেলে আর. জি. করের স্কুলের পাশ গ্রাম্য ডাক্তার। আমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল।

আমি আড়ালে ডেকে বললাম—কি দিয়েছেন? প্রেসক্রিপসানগুলো দেখি?

শিবু বললে—কুইনিন দিচ্ছি।

—ভুল করেচেন। যখন দেখলেন জ্বর বন্ধ হচ্চে না, তখন কুইনিন বন্ধ করা উচিত ছিল। এ হোল টা[illegible]ড, সেদিনই যাচ্চে।

—আমিও তা ভেবেচি—অ্যালকালি মিকশ্চার দুদিন দিয়ে [illegible]াম।

—কাগজ আমুন। লিখে দিই।

—একটা ডুশ, দেবো কি? ভাবছিলাম—

—না। বাই নো মিন্স্—

গৃহকর্তা কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসে বললেন—আপনি আমাদের জেলার ধন্বন্তরি। ছেলেটা মা-মরা, ছ'মাস থেকে মনুষ করেছি—

আমি আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললাম—ভয় নেই, ভগবানকে ডাকুন। সেরে যাবে, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র। সঙ্গে লোক দিন ওষুধ নিয়ে আসবে।

শিবু ডাক্তার আশ্চর্য্য হয়ে বললে—ওষুধ সার আমার ডিস্‌পেনসারি থেকে—

—আপনার এখানে সব ওষুধ নেই। আমি সম্প্রতি কলকাতা থেকে আনিয়েচি—সুবিধে হবে।

—যে আজ্ঞে সার।

শিবু একটু দমে গেল। ওষুধের দামে ভিজিটের তিনগুণ আদায় করে থাকে এই সব পল্লীগ্রামের ডাক্তার—আমার জানা আছে, আমি তার প্রশ্রয় দিই নে। পাঁচ আনার ওষুধের দাম আদায় করে ছ টাকা।

সন্ধ্যার পর নৌকোতে ফিরলাম। অন্ধকার রাত, ঝোপে ঝাড়ে শেয়াল ডাকচে, জোনাকি জ্বলচে। এক জায়গায় একটা শব নিয়ে এসেচে দাহ করতে। নদীতীরে বাবলা তলায় পাঁচ, ছ'জন লোক বসে জটলা করচে, তামাক খাচ্চে, দু'জনে চিতা ধরাচ্চে।

সনাতনদা হেঁকে বললে—কোথাকার মড়া হে?

ওয়া উত্তর দিলে—বাঁশদ' মানিকপুর—

—কি জাত ?

—কর্ম্মকার—

—বুড়ো না জোয়ান ?

ধমকের সুরে বললাম—অত খবরে তোমার কি দরকার হে ? চুপ করে বোসো। ধরাও একটা সিগারেট, এই নাও।

সনাতন বললে—একটা কথা আছে। আমাদের গ্রামের তুমিই এখন মাথা। তোমাকে বলতেই হবে। রামপ্রসাদ চাটুয্যে আমাদের গ্রামের লালমোহন চক্কত্তির মেয়েটার কাছে যাতায়াত করচে অনেকদিন থেকে। এ খবর রাখো ?

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—সে কি কথা ? শান্তিকে তো খুব ভালো মেয়ে বলেই জানি।

—তুমি ও খবর কি রাখবে ? নিজের রুগী নিয়েই ব্যস্ত থাকো। দেবতুল্য মানুষ। এ কথা তোমাকে বলবো বলেই আজ নৌকাতে উঠেচি। এর একটা বিহিত করো।

—তুমি প্রমাণ দিতে পারো ?

—চক্কত্তি পাড়ার সব লোক বলবে কাল তোমার কাছে। কালই সব ডাকাও।

—নিশ্চয়ই। এ যদি সত্যি হয় তবে এর প্রশ্রয় আমি দিতে পারি নে গাঁয়ে। আমায় তো জানো—

—জানি বলেই তোমার কানে তুললাম কথাটা—এখন যা হয় করো তুমি।

শাসন করে দিতে হবেই যদি সত্য হয়, কাল সব ডাকি। দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না, দেবোও না কখনো।

সে আর আমি জানিনে! কুদির মুখে বাঁক জব্দ। তুমি ভিন্ন ভায়া এ গাঁয়ে মানুষ কে আছে, কার কাছে বলবো! সবাই ওই দলের।

রাত্রে সুরবালাকে কথাটা বললাম। সে বললে—শান্তি ঠাকুরঝি এদিকে তো ভাল মেয়ে, তবে অল্প বয়সে বিধবা, একা থাকে। তুমি কিছু বলো না আগে—মেয়ে মানুষের ব্যাপার। আগে শোনো। মুখে সাবধান করে দিলেই হবে।

আমি ঝাঁজের সঙ্গে বললাম—মুখে সাবধানের কর্ম্ম নয়। দুর্নীতি গোড়া থেকে চেপে মারতে হয়—নইলে বেড়ে যায়। সেবার হরিশ সরকারের বৌটাকে কেমন করে শাসন করে দিয়েছিলুম জান তো? যার জন্যে দেশ ছাড়া হয়ে চলে গেল।

সুরবালা শান্তস্বরে বললে—সেটা কিন্তু তোমার ভাল হয় নি। অতটা কড়া হওয়া কি ঠিক?

—আলবৎ ঠিক। যা-তা হবে গাঁয়ের মধ্যে!

—চিরকাল হয়ে আসচে। ওসব দেখেও দেখতে নেই। নিজের নিয়ে থাকো, পরের দোষ দেখে কি হবে? ভগবান আমাদের যথেষ্ট দিয়েচেন—সবাই মানে চেনে ভয় করে গাঁয়ের মধ্যে। সত্যি কথা বলি তবে, শান্তি ঠাকুরঝি কাল আমার কাছে এসেছিল। এসে আমার হাত ধরলে। বললে—এই রকম একটা কথা আমার নামে দাদার কাছে ওঠাবে লোকে,

আমার ভয়ে গা কাঁপচে। তুমি একটু দাদাকে বোলো বৌদি। বেচারী তোমার কাছে নালিশ হবে শুনে—

ওসব কথার মধ্যে তুমি থেকো না। সমাজের ব্যাপার, গ্রামের ব্যাপার—এ অন্য চোখে দেখতে হয়। শাসন না করে দিলে চলে না—বেড়ে যাবে।

পরদিন গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির সভ্যদের ডাকাই। শাস্তির ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্যে।

পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই আমি জানি। এ সমিতির আমিই সব, আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবার লোক নেই এই গাঁয়ে। আমিই সমিতির সেক্রেটারী, আমিই সভাপতি —আমিই সব।

সভায় আমি নিজেই প্রস্তাব করলাম, রামপ্রসাদ চাটুয্যেকে ডাকিয়ে এনে শাসন করে দেওয়া যাক। সকলে বললে—তুমি যা ভাল মনে করো।

সনাতনদা বললে—রামপ্রসাদ ইউনিয়ান বোর্ডের টেক্স আদায়কারী বলে ওর বড্ড বাড় বেড়েছে। লোকের যেন হাতে মাথা কাটছে—আরে সেদিন আমি বললাম, আমার হাত খালি, এখন টেক্সটা দিতে পারচিনে, দুদিন রয়ে সয়ে নাও দাদা। এই বলে, তোমার নামে ক্রোকী পরওয়ানা বের করবো, হেন করবো, তেন করবো—

আমি বললাম—ও সব কথা এখানে কেন? ব্যক্তিগত কোনো কথা এখানে না ওঠানোই ভালো। তুমি টেক্স দাওনি, সে যখন আদায়কারী, তখন তোমাকে বলবে না কি ছেড়ে দেবে?

শম্ভু সরকার বললে, সে তো ন্যায্য কথা।

আমি বললাম, শাসন করবো একটু ভাল করেই। কাল দারোগা আমার এখানে আসচে, দারোগাবাবুকে দিয়েই কথাটা বলাই। তাহোলে ভয় খেয়ে যাবে এখন।

সভা থেকে ফিরবার পথে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে কাঁটালতলায় দেখি কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বোধ হয় আমার জন্যে অপেক্ষা করচে। আমি গাছতলায় পৌছতেই মেয়েটি হঠাৎ আমার পায়ে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

শশব্যস্তে বলে উঠলাম—কে ? কি হয়েচে, ছাড়ো, ছাড়ো, পায়ে হাত দেয় যে—

ততক্ষণে চিনেচি মেয়েটি শান্তি।

শান্তি লালমোহন চক্রবর্ত্তীর মেজমেয়ে। বছর বাইশ-তেইশ বয়েস্, আমার চেয়ে অন্তত বারো-তেরো বছরের ছোট, আমাকে পাড়াগাঁ হিসাবে দাদা বলে ডাকে।

কান্না-ধরা গলায় বললে—শশাঙ্কদা আমায় বাঁচাও। তুমি আমার বড় ভাই।

—কি হয়েছে ? ব্যাপারটা কি শুনি।

—আমার নামে নাকি কি উঠেচে কথা। আমায় নাকি পুলিশে পাঠাবে, চৌকিদার দিয়ে ধরে থানাতে নিয়ে যাবে। সবাই বলাবলি করচে। তোমার পায়ে পড়ি দাদা—আমি কোনো দোষে দোষী নই—বাঁচাও আমায়।

শান্তিকে দেখে মনে দুঃখ হোল, রাগও হোল। লালমোহন কাকার মেয়ে গাঁয়ে বসে এমন উচ্ছন্ন যাচ্চে। এ যতই এখন

মায়া কান্না কাঁদুক—আসলে এ মেয়ে ভ্রষ্টা, কলঙ্কিনী। ওর, কান্না মিথ্যে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুঃখ হোল ভেবে, লালমোহন কাকা এক পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভবের হাট-বাজার তুলে দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন—দুবছর চলে না যেতে যেতে জামাই শ্বশুরের অনুসরণ করলেন। পনেরো বছরের মেয়ে চালাঘরে মায়ের কাছে ফিরে এল সিঁথির সিঁদুর মুছে। গরীব মা, নিজের পেট চালায় সামান্য একটু জমি-জমার আয়ে। ভাইও আছে—কিন্তু সে নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আলাদা বাস করে। মাকেই খেতে দেয় না—তায় বিধবা বোন!

এ অবস্থায় কেউ যদি মেয়েটিকে প্রলোভন দেখায়—বিপথে পা দিতে সে মেয়ের কতক্ষণ লাগে?

মুখে কড়াস্বরে বললুম—শান্তি, রাস্তাঘাটে সে সব কথা হয় না। আমার বাড়ীতে যেও, তোমার বউদি থাকবেন, সেখানে কথাবার্ত্তা হবে। তবে তোমাকে থানাপুলিসের ভয় যদি কেউ দেখিয়ে থাকে সে মিছে কথা। পুলিশের এতে কি করবার আছে? বাড়ী যাও, ছিঃ!

শান্তি তবুও কান্না থামায় না। আকুল মিনতির সুরে বলতে লাগলো—একটু দাঁড়াও, দাদা পায়ে পড়ি, একটু দাঁড়াও!

আঃ কি মুশকিল? শান্তির সঙ্গে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলতে দেখলে কেউ কিছু মনেও করতে পারে। ও মেয়ের চরিত্র কেমন, জানতে আর লোকের বাকী নেই।

বললাম বিশেষ কিছু বলবার আছে তোমার?

—শশাঙ্কদা, তুমি আমায় বাঁচাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—হবে, হবে। কোনো ভয় নেই।

পরক্ষণেই শাস্তি এক অদ্ভুত ধরনে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে—সত্যি শশাঙ্কদা? আমি—আমাকে—

আমি এতক্ষণে বুঝতে পারিনি ও কি বলতে চাইচে, এইবার ওর কথার সুরে ও মুখের ভাবে বুঝে নিয়ে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলাম। আমি ডাক্তার, ও সাহায্য চাইচে আমার কাছে, কিন্তু এ সাহার্য্য আমার দ্বারা হবে ও ভাবলে কেমন করে? আশ্চর্য্য!

শাস্তি মুখ নীচু করে ধরে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো।

অবশেষে আমার মুখে কথা ফুটলো। আমি বললাম—তুমি এতদূর নেমে গিয়েচ শাস্তি? তুমি না লালমোহন কাকার মেয়ে? কত ভাল লোক ছিলেন কাকা, কত ধাৰ্ম্মিক ছিলেন—এ সব কথা মনে পড়ে না তোমার?

শাস্তি আবার কাঁদিতে শুরু করলে।

নাঃ, এ সব ছলনাময়ী ঘ্যানঘেনে প্যানপ্যানে মেয়ের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি জাগে না। পুনরায় কড়া সুরে বললাম—আমার দ্বারা তোমার কোনো সাহায্য হবে এ তোমার আশা করাই অন্যায়। জানো, এ সবের প্রশ্রয় আমি দিইনে?

—আমার তবে কি উপায় হবে শশাঙ্কদা ?

—আমি বলতে পারিনে। আমি চললাম, তোমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় নেই আমার।

বাড়ী এসে সুরবালাকে সব বললাম। সুরবালা বললে—ওই পোড়ারমুখীই নষ্টের গোড়া। রামপ্রসাদ ঠাকুরপোর কোনো দোষ নেই।

—তোমার এ কথা আমি মানলাম না।

—মেয়ে মানুষের ব্যাপার তুমি কি জানো ? তুমি শাস্তির কান্নাতে গলে গিয়েচ, ভাবচো ও বুঝি নিরীহ, আসলে তা নয়, এই তোমাকে বললাম।

—তোমার যুক্তি আমি বুঝতে পারলাম না।

—পারবেও না। ডাক্তারিই পড়েচ, আর কিছুই জান না সংসারের।

রামপ্রসাদের উপর অত্যন্ত রাগ হোল। আমাদের গ্রামের মধ্যে এমন সব কাজ যে করতে সাহস করে, তাকে ভালোভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

দারোগাকে একখানা চিঠি লিখে পাঠালুম। লিখলে—একদিন আপনাদের ওখানে গিয়ে লোক জব্দ করে দেবো যে, সে এ মুখে আর না।

রামপ্রসাদ চাটুয্যে লোকটি মদ খায় বলে কোনোদিনই ছিল না। কতদিন তাকে লিভারের অসুখ হয়ে মরবে। মদ এখনও ছা

পড়লো গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির ঘরের সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র মাঠে। লোকজন অনেক জড় হোল ব্যাপার কি দাঁড়ায় দেখবার জন্তে। রামপ্রসাদ চোখে চশমা দিয়ে ফরসা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সভায় এসে হাজির হোল। গ্রামের সব লোকই আমার পক্ষে। ডাক্তারকে কেউ চটাবে না!

দারোগা রামপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলে—আপনার বিরুদ্ধে গ্রামের লোকের কি অভিযোগ জানেন?

রামপ্রসাদ শুষ্কমুখে বললে—আজ্ঞে—আজ্ঞে—না।

—আপনি গ্রামের একটা মেয়েকে নষ্ট করেছেন!

—আজ্ঞে, আমি!

—হাঁ, আপনি।

আমার ইঙ্গিতে সনাতনদা বললে—উনি সে মেয়েমানুষটিকে নিজের বাড়ীতে দিনকতক রেখেছিলেন। উনি বিপত্নীক। আর একটা কথা, বাড়ীতে ওর একটা মেয়ে প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে, অথচ সেই মেয়েমানুষটাকে উনি বাড়ী নিয়ে গিয়ে রাখেন।

দারোগা বললে—আমি এমন কথা কখনো শুনিনি। ভদ্র-লোকের গ্রামে আপনি বাস করেন, অথচ সেই গ্রামেরই একটি মেয়েকে আপনি এভাবে নষ্ট করেছেন?

সনাতন বললে—সে মেয়েও ভদ্রঘরের মেয়ে, স্যার। উনিই তাকে নষ্ট করেছেন।

—মেয়েটি কি জাতের?

—ব্রাহ্মণ বংশের স্যার। সে কথা বলতে আমাদের মাথা

কাটা যাচ্ছে—ওর ঘরে সোমত্ত মেয়ে, অথচ উনি—

দারোগা রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললে—একি শুনছি? আপনাকে এতক্ষণ 'আপনি' বলছিলাম, কিন্তু আপনি তো তার যোগ্য নন—'তুমি' বলতে হচ্ছে এইবার। তুমি দেখছি অমানুষ। ভদ্দরলোকের গ্রামের মধ্যে বাস করে যা কাণ্ড তুমি করছো, ব্রাহ্মণের ছেলে না হোলে তোমাকে আজ চাব্‌কে দিতাম! বদমাশ কোথাকার!

রামপ্রসাদের মুখ অপমানে রাঙা হয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে হাজার হোক, গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, চশমা চোখে, ফরসা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বেড়ায়, যদিও লেখাপড়া কিছুই জানে না—এভাবে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে জীবনে কখনো সে অপমানিত হয়নি। লজ্জা ও ভয়ে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। পুলিশকে এই সব পল্লীগ্রামে বিশেষ ভয় করে চলে লোকে, তার সঙ্গে যোগ-সাজস করেছে আমার মত ডাক্তার, এ অঞ্চলে যার যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি। ভয়ে ও অপমানে রামপ্রসাদ কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে দারোগার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা বাজখাঁই আওয়াজে ধমক দিয়ে বললে—উত্তর দিচ্ছ না যে বড়, বদমাশ কাঁহাকা!

রামপ্রসাদ আমতা আমতা করে কি বলতে গেল, কেউ বুঝতে পারলে না।

আমি তবুও একটা কথা দারোগাকে বলিনি। সেটা হোল শান্তির বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার কথা। শান্তি বতই

দুশ্চরিত্র হোক, সে আমার সাহায্য চেয়েছিল চিকিৎসক বলে। রোগীর গুপ্ত কথার প্রকাশের অধিকার নেই ডাক্তারের, সাহায্য আমি তাকে করি না করি সে আলাদা কথা।

বৃদ্ধ চৌধুরী মশাই আমায় বললেন—যথেষ্ট হয়েছে বাবাজী, হাজার হোক ব্রাহ্মণের ছেলে, ওকে ছেড়ে দাও এবার। কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু রামপ্রসাদ কাঁদো কাঁদো হয়নি, ওটা বৃদ্ধের ভুল। ভয়ে ও এমন হয়ে গিয়েছে। বাপের অনেক সম্পত্তি ছিল, তার বলে সে বাবুগিরি করছে, লোকের উপর কিছু কিছু প্রভুত্বও করেছে কিন্তু লেখাপড়া না শেখার দরুন দারোগা পুলিশকে তার বড় ভয়। পুলিশের দারোগা দিন দুনিয়ার মালিক—এই তার ধারণা। আমি এটুকু জানতাম বলেই আজ দারোগাকে এনে তাকে শাসনের এই আয়োজন। নইলে অনেক ভাল কথা বলে দেখেছি, অনেক শাসিয়েছি, তাতে কোন ফল হয় নি। আমি চৌধুরী মশাইকে বললাম—ওকে ভাল করে শিক্ষা না দিয়ে আজ ছাড়ছি নে। এ ধরনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারি নে গাঁয়ে।

রামপ্রসাদ হাতজোড় করে বলেল—এবারের মত আমায় মাপ করুন দারোগাবাবু—

দারোগা বললে—আমি তোমার কাছে থেকে মুচলেকা লিখিয়ে নেবো—যাতে এমন কাজ আর কখনো ভদ্রলোকের গ্রামে না করো। তাতে লিখে দিতে হবে।

রামপ্রসাদ আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললে—এবারের মত আমায় মাপ করুন দারোগাবাবু।

—মুচলেকা না দিয়েই ? কক্ষনো না। লেখো মুচলেকা !

পাড়াগাঁয়ের লোক রামপ্রসাদ, যতই শৌখিন হোক বা বাবু হোক, পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামাকে যমের মত ভয় করে। আমি, জানি এ মুচলেকা দেওয়ার কোনো মূল্যই নেই আইনের দিক থেকে, কোনো বাধ্যবাধকতাই নেই এর—রামপ্রসাদ কিন্তু ভয়ে কাঁটা হয়ে গেল মুচলেখা লিখে দেওয়ার নাম শুনে।

—দাও, দাদা—লেখো আগে।

—এবার দয়া করুন দারোগাবাবু। আমি বরং এ গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, বলুন আপনি—

—কোথায় যাবে ?

—পাশের গ্রামে বর্দ্ধমবেড়ে চলে যাই। আপনি যা বলেন।

—সেই মেয়েটিকে একেবারে ছেড়ে চলে যেতে হবে—

—আপনার যা হুকুম।

দারোগা আমার দিকে চেয়ে বললে—তাহোলে তাই কর। বছরখানেক এ গাঁ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। মেয়েটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবে না আর, এই বলে দিচ্ছি।

—যে আজ্ঞে—

—ক'দিনের মধ্যে যাবে ?

—পনেরোটা দিন সময় দিন আমায়।

—তাই দিলাম। যাও, এখন চলে যাও।

দারোগাবাবু আমার বাড়ী চা খেতে এসে বললে—কেমন

বন্ধ করে দিয়েছি বলুন ডাক্তারবাবু? আর কখনো ও এ পথে পা দেবে না। যদি ওর জ্ঞান থাকে। কি বলেন?

—আমার তাই মনে হয়।

—কবে আমার ওখানে আসছেন বলুন—একদিন চা খাবেন আমার বাড়ী।

—হবে সামনের হপ্তায়।

—ঠিক তো? কথা রইল কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

দারোগা চলে গেলে সুরবালার সঙ্গে দেখা হোল বাড়ীর ভেতরে। সে বললে—হ্যাঁগা, আমি কি তোমার জ্বালায় গলায় দড়ি দেবো, না, মাথা কুটে মরবো?

—কেন কি হোল?

—কি হোল? কেন তুমি রামপ্রসাদবাবুকে আজ অমন করে পাঁচজনের সামনে আপমান করলে বল তো? তোমার ভীমরতি ধরবার বয়েস তো এখনও হয়নি?

—কে বললে তোমাকে এসব কথা?

সুরবালা ঝাঁজের সঙ্গে বললে—আমার কানে কথা যায় না ভাবছো? সব কথা যায়। নাক-ছেঁদা গিন্নি এসে আমায় সব কথা বলে গেল—বৌমা, এই রকম কাণ্ড। নাক-ছেঁদা গিন্নি অবিশ্যি খুব খুশি। তোমাকে নমস্কার্য্যি কে না করবে এ গাঁয়ের মধ্যে? কিন্তু এ কাজটা কি ভালো?

—নাক-ছেঁদা গিন্নি এ সংবাদ এর মধ্যে পেয়ে গিয়েছেন?

বাবাঃ, গাঁয়ের গেজেট কি আর সাধে বলে! তা কি বকবে শুধুই, না, খেতে-টেতে দেবে আজ?

সুরবালা আর এক দফা সদুপদেশ বর্ষণ করলে খাওয়ার সময়। গ্রামের মধ্যে কে কি করছে সে সব কথার মধ্যে আমার দরকার কি? নিজের কাজ ডাক্তারি, তা নিয়ে আমি থাকতেই তো পারি। সব কাজের মধ্যে মোড়লি না করলে কি আমার ভাত হজম হয় না?

আমি ধীরভাবে বললাম—তা বলে গাঁয়ে যে যা খুশি করবে?

—করুক গে তোমার কি? যে পাপ করবে, ঈশ্বর তার বিচার করবেন। তোমার সর্দ্দারি করতে যাওয়ার কি মানে? অপরের পাপের জন্যে তোমার তো দায়ী হতে হবে না।

—কি জানো, তুমি মেয়েমানুষের মত বলছো। আমি এখন এ গাঁয়ে পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারি, পাঁচজনে মানে চেনে। এ আমি না দেখলে কে দেখবে বল। গ্রামের নীতির জন্যে আমি দায়ী নিশ্চয়ই।

—বেশ, ভালো কথায় বুঝিয়ে বলো না কে মানা করছে? আপমান করবার দরকার কি?

—বুঝিয়ে বলিনি? অনেক বলেছি। শুনতো যদি তবে আজ আমায় এ কাজ করতে হোত না।

সুরবালা যাই বলুক, সে মেয়েমানুষ, বোঝেই বা কি—আমি কিন্তু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম সে রাত্রে। আমি থাকতে এ গ্রামে ও সব ঘটতে দেবো না। একটা পুরুষমানুষ ভুলিয়ে একটা সরলা মেয়ের সর্ব্বনাশ করবে, এ আমি কখনই হোতে দিতে পারি নে।

সুরবালা এখানে আমার সঙ্গে এক মত নয়। সে বলে রামপ্রসাদের দোষ নেই। শান্তিই ওকে ভুলিয়েছে। অসম্ভব কথা, শান্তিকে আমি এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি, মাখম মাস্টারের স্কুলে যখন পড়ি, শান্তি তখন ছোট্ট শাড়ি পরে সাজি হাতে পাঠশালার বাগানে ফুল তুলতে আসতো, আঁচলে বেঁধে গুগলি কুড়িয়ে নিয়ে যেতো নাক-ছেঁদা গিন্নিদের ডোবা থেকে —সেই শান্তি কাউকে ভোলাতে পারে।

সকালে উঠে আমি দূরগ্রামে ডাকে চলে গেলাম। ফিরে আসতেই সুরবালা বললে—আজ খুব কাণ্ড হয়ে গেল—কি হাঙ্গামাই তুমি বাধিয়েছ!

—কি হোল?

—শান্তি ঠাকুরঝি সকালে এসে হাজির। কেঁদে কেটে মাথা কুটে সকালবেলা সে এক কাণ্ডই বাধালো! আমার পায়ে ধরে সে কি কান্না, বলে—শশাঙ্কদা এ কি করলেন? আমি তাঁকে বিশ্বাস করে সব কথা বললাম, অথচ তিনি—

সুরবালা সব কথা জানে না, আমি বললাম—ওর ভুল। ওর কোনো গোপন কথা সেখানে প্রকাশ করিনি—

সুরবালা অবাক হয়ে বললে—করনি?

—কক্ষনো না।

সুরবালা আশ্বস্ত হওয়ার সুরে বললে—যাক এ কথা আমি কালই বলবো শান্তিকে।

আমি রেগে বললাম—ওকে আর বাড়ী ঢুকতে দিও না—

—ছিঃ ছিঃ, মানুষের ওপর অত কড়া হতে নেই। তুমি তাকেকিছু বলতে পারো তোমার বাড়ী এলে?

—খুব পারি, যার চরিত্র নেই সে আবার মানুষ ?

—আমার একটা কথা রাখবে লক্ষ্মীটি ?

—কি ?

থাকগে তোমার ডাক্তারি। চলো এ গাঁ থেকে আমরা দিনকতক অন্য জায়গায় চলে যাই।

—কেন বল তো ?

—কেন জানিনে। তোমার মোড়লগিরি দিনকতক বন্ধ রাখো। লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে কি লাভ ? রামপ্রসাদকে দারোগা গাঁ ছেড়ে যেতে বলেছে—এটা কি ভালো ?

—ওই এক কথা পঞ্চাশ বার আমার ভাল লাগে না। যে দুশ্চরিত্র, তাকে কখনো এ গাঁয়ে আমি শান্তিতে থাকতে দেবো না।

—আমার কথা শোনো লক্ষ্মীটি, তোমার ভালো হবে।

কিন্তু ওসব কথায় কান দিতে গেলে পুরুষ মানুষের চলে না। মনে মনে শান্তির ওপর খুব রাগ হোল। আমার বাড়ীতে আসবার কোনো অধিকার নেই তার। এবার ঢুকলে তাকে অপমান হতে হবে।

সনাতনদা বিকলের দিক আমার এখানে চা খেতে এসে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বলে—আরে, তুমি যা করলে—বাবাঃ—পেটে খিল ধরে যাচ্ছে হেসে—

—কি, হয়েছে কি সনাতনদা ?

সনাতনদা দম নিয়ে বললে—ওঃ ! রও, একটু সামলে নিই—

—কি ব্যাপার ?

—হ্যাঁ, জব্দ করে দিলে বটে ! বাবাঃ, কুঁদির মুখে বাঁক থাকে ? কার সঙ্গে লেগেছে রামপ্রসাদ ভেবে দেখেছে কি ? পুরুষ মানুষের মত পুরুষ মানুষ বটে তুমি ! সমাজে চাই এমনি বাঘের মত মানুষ, নইলে সমাজ শাসন হবে কি করে ?

সনাতনদার কথাগুলি আমার ভালই লাগলো। সনাতনদাকে লোকে দোষ দেয় বটে, কিন্তু ও খাঁটি কথা বলে। বেঁটে খাটো লোক, অপ্রিয় কথাও বলতে অনেক সময় ওর বাধে না। অমন লোক আমি পছন্দ করি।

তবুও আমি বললাম—যাক, পরনিন্দে করে আর কি হবে সনাতনদা, ওতে যদি রামপ্রসাদদা ভাল হয়ে যায়, আমি তাই চাই ! ওর ওপর অন্য কোনো রাগ নেই আমার।

সনাতনদা গলার স্বর নিচু করে বললে—ও কাল কি করছিল জানো ? তোমাদের ওই ব্যাপারের পরে কাল বড় মুখুজ্যে মশায়ের কাছে গিয়েছিল। গিয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—আমাকে পাঁচজনের সামনে এই যে অপমানটা করলে, আপনারা এর একটা বিহিত করুন। নইলে গ্রামে বাস করি কি করে ?

—কি বললেন জ্যাঠামশায় ?

—বললেন, শশাঙ্ক হোলো গ্রামের ডাক্তার—শুধু ডাক্তার নয়, বড় ডাক্তার। বিপদে আপদে ওর দ্বারস্থ হতেই হয়। তার বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারবো না। এই কথা বলে বড়

মুখুজ্যে মশায় বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। সত্যই তো, ছেলেপিলে নিয়ে সবাই ঘর করে, কে তোমাকে চটিয়ে গাঁয়ে বাস করবে বল তো ?

—তা নয় সনাতনদা। এ জন্যে আমায় কেউ খোশামোদ করুক—এ আমি চাইনে। ডাক্তারি আমার ব্যবসা, কিন্তু সমাজের প্রতি আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে, যেটা খুব বড়। যতই তার ওপর রাগ থাকুক, বিপদে পড়ে ডাকতে এলে বরং শত্রুর বাড়ী আমি আগে যাবো ! ওই রামপ্রসাদদার যদি আজ কোনো অসুখ হয়, তুমি সকলের আগে সেখানে আমায় দেখতে পাবে।

সনাতনদা কথাটা শুনে একটু বোধ হয় অবাক হয়ে গেল, আমার মুখের দিকে খানিকটা কেমন ভাবে চেয়ে রইল। তারপর কতকটা আপন মনেই বললে—শিবচরণ কাকার ছেলে তুমি, তিনি ছিলেন মহাপুরুষ লোক, এমন কথা তুমি বলবে না তো কে বলবে ?

সনাতদা এটা আমার মন রাখবার জন্যে বললে। কারণ এ গ্রামের কে না জানে, আমার বাবা তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির অর্দ্ধেক উড়িয়েছিলেন মদে আর মেয়েমানুষে। তবে শেষের দিকে হাতে পয়সা যখন কমে এল, তখন হঠাৎ তিনি ধর্ম্মে মন দেন এবং দানধ্যান করতে শুরু করেন। প্রতি শীতকালে গরীব লোকের মধ্যে বিশ-ত্রিশখানা কম্বল বিলি করতেন, কাপড় দিতেন—এসব ছেলেবেলায় আমার দেখা। পৈত্রিক সম্পত্তির যা-কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা তিনি উড়িয়ে দেন এই দানধ্যানের

বাতিকে। কেবল এই বসত বাড়িটুকু ঘুচিয়ে দিতে পারেন নি শুধু এই জন্যে যে, সেকালে লোকের ধর্ম্মভয় ছিল, ব্রাহ্মণের ভদ্রাসন কেউ মর্টগেজ রাখতে রাজী হয়নি।

সন্ধ্যার সময় ওপাড়া থেকে ফিরছি, পথে আবার শান্তির সঙ্গে দেখা। দেখা মানে হঠাৎ দেখা নয়, যতদূর বুঝলাম, শান্তি আমার জন্যে ওৎ পেতে এখানে দাঁড়িয়েছিল। বললাম—কি শান্তি, ব্যাপার কি ? এখানে দাঁড়িয়ে এ সময় ?

শান্তি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি শশাঙ্কদা।

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম। এ ভাবে নির্জ্জন পথে শান্তির মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলা আমি পছন্দ করি নে। বললামও কথাটা। তার দরকার থাকে, আমার বাড়ীতে সে যেতে পারে। তার বৌদির সামনে কথাবার্ত্তা হবে। পথের মাঝখানে কেন ?

শান্তি বললে—শশাঙ্কদা, তোমার ওপর আমার ভক্তি আগেও ছিল। এখন আরও বেশি।

আমি এ কথা ওর মুখ থেকে আশা করিনি, করেছিলাম অনুযোগ—তাও নিতান্ত গ্রাম্য ধরনে, অর্থাৎ গালাগালি। তার বদলে একি কথা ? এই কথা শোনাবার জন্যে ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে ! বিশ্বাস হোল না !

বললাম—আসল কথাটা কি শান্তি ?

—আর কিছু না, মাইরি বলচি শশাঙ্কদা—

বেশ, তুমি বাড়ী যাও—

শান্তি একটু হেসে বললে—আমার একটা কথা রাখবে শশাঙ্কদা? তোমার ডাক্তারখানা থেকে আমায় একটু বিষ দিতে পারো?

আমার বড় রাগ হয়ে গেল। বললাম—ঘোর-পেঁচ কথা আমি ভালবাসিনে, যা বলবে সামনা সামনি বলো। ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিলাম—কোন্ কথা থেকে এ কোন্ কথার আমদানি করলে? বিষ কি হবে? খেয়ে মরবে তো? তা অনেক রকম উপায় আছে মরবার। আমায় এর জন্যে দায়ী করতে চাও কেন জিজ্ঞেস করি? ভক্তি আছে বলে বুঝি?

শান্তি বলেল—ঠিক বলেছ দাদা। আর তোমাদের বোঝা হয়ে থাকবো না। দাঁড়াও, একটু পায়ের ধুলো দাও দাদা—

কথা শেষ করেই শান্তি আমার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে দুহাতে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। মনে হোল, ও কাঁদচে, কারণ কথার শেষের দিকে ওর গলা কেঁপে গেল যেন।

পায়ের ধুলো নিয়ে মাথা তুলেই ও আর কোন কথাটি না বলে চলে যেতে উদ্যত হোল।

আমার তখন রাগটা কেটে গিয়ে একটু ভয় হয়েছে। মেয়েমানুষকে বিশ্বাস নেই, সত্যি সত্যি মরবে না কি রে বাবা!

বললাম—দাঁড়াও, একটা কথা আছে শান্তি!

শান্তি ফিরে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কি?

—সত্যি সত্যি মরো না যেন তাই বলে।

—তা ছাড়া আমার কি আছে করবার? সমাজের পথ

আজ বন্ধ হোল, সব পথ বন্ধ হোল, বেঁচে থেকে লাভ কি বলো ?

সমাজের পথ কে বন্ধ করলে ? অন্য লোকের দোষ দাও কেন, নিজের দোষ দেখতে পাও না ?

—আমি কারো দোষ দিচ্ছিনে শশাঙ্কদা, সবই আমার এই পোড়া অদৃষ্টের দোষ—অদৃষ্টের দোষ—কথা শেষ করে শান্তি নিজের কপালে হাতের মুঠো দিয়ে মারতে লাগলো, আর থামে না। ভালো বিপদে পড়ে গেলাম এ সন্ধ্যাবেলা পথের মধ্যে। বাধ্য হয়ে ওর কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে বললাম—এই ! কি হচ্ছে ও সব ? শান্তি তবুও থামে না, আমি তখন আর কি করি, ওর হাতখানা ধরে ফেলে বললাম—ছিঃ, ও রকম করতে নেই—যাও, বাড়ী যাও—কি কেলেঙ্কারি হচ্ছে এ সব ?

শান্তি বললে—না দাদা, আর কেলেঙ্কারী করে তোমাদের মুখ হাসাবো না। নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি শীগগির—বলে আবারও সেই রকম অদ্ভুত হাসলে।

—আর যাই কর, আত্মহত্যা মহাপাপ, ও কোরো না—

—কে বললে ?

—আমি বলছি। শাস্ত্রে আছে।

শান্তি হেসে বললে—আচ্ছা দাদা, তোমরা শাস্তর মানো ?

—মানি।

—আত্মহত্যে হলে কি হয় ?

—গতি হয় না।

—বেশ তো, হাঁ দাদা, আমি ম'লে তুমি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসতে পারবে না আমার নামে ? বেঁচে থাকতে না পারো

পোড়ার মুখী বোনের উপকার সাহায্য করতে—মরে গেলে কোরো।

শান্তির কথা শুনে আমার বড় মমতা হোল ওর ওপর। কেমন এক ধরনের মমতা।

সুর নরম করে বললাম—ও সব কিছু করতে হবে না শান্তি—

—তা হোলে বলো তুমি উপকার করবে?

—তোমার উপকার করা মানে মহাপাপ করা। তুমি যে উপকারের কথা বলছো, তা কখনও ভালো ডাক্তারে করে না। আমি নিরুপায়।

—সত্যি দাদা, সাধে কি ভক্তি হয় আপনার ওপর? আপনার ধূলির যোগ্য কেউ নেই এ গাঁয়ে।

—আমার কথা ছেড়ে দাও শান্তি। আর একজন আছে এ গাঁয়ে—সে সত্যিই কোনো দুর্নীতি দেখতে পারে না সমাজের। সনাতনদা।

শান্তি অবিশ্বাসের সুরে বললে—তুমি এদিকে বড্ড সরল, শশাঙ্কদা, ওকে তুমি বিশ্বাস কর?

—কেন?

—সনাতনদা এসেছে কাজ বাগাতে তোমার কাছে। খোশামোদ করা ছাড়া ওর অন্য কোনো কাজ নেই—

—যাক্‌গে, ও কথার দরকার নেই, আমার কাছে কথা দিয়ে যাও তুমি আত্মহত্যার কথা ভাববে না।

—আমার উপায় হবে কি তবে?

—সে আমি জানিনে। তার কোন ব্যবস্থা আমায় দিয়ে হবে না।

—তা হোলে আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করি, তুমি যখন কিছু করবে না—

শান্তি চলে গেল বা ওকে আমি যেতেই দিলাম। আর বেশিক্ষণ ওর সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা আমার উচিত হবে না। হয় তো কেউ দেখে ফেলবে, তখন পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করে দেবে, শান্তির যা সুযশ এ গাঁয়ে। বাড়ি ফিরে সুরবালাকে কথাটা এবার আর বললাম না কি ভেবে, কিন্তু সারা রাত ভালো ঘুম হোল না। সত্যি শান্তির উপায় কি? একা মেয়েমানুষ, কি করে এ দারুণ অপযশ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে,—আর হয়তো ছয়মাস পরে সে বিপদের দিন ওর জীবনে এসে পড়বেই। আমার দ্বারা তখন সাহায্য হতে পারে, তার পূর্ব্বে নয়।

কিন্তু সকালবেলা যা কানে গেল তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

বেলা সাড়ে আটটা। সবে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, এমন সময় সনাতনদা আর মুখুজ্যে জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে হারান হন্তদন্ত হয়ে হাজির। ওদের চেহারা দেখে আমি বুঝলাম, একটা কিছু ঘটেছে! আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই সনাতনদা বললে—এদিকে শুনেছ কাণ্ড?

—কি ব্যাপার?

—শান্তি আর রামপ্রসাদ দুজনে কাল ভেগেছে।

—কে বললে? কোথায় ভাগলো?

—নাক-ছেঁদা ঝিঙি ভোরবেলায় পুজোর ফুল তুলতে

গিয়েছিলেন বড় মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ী। তিনি শুনলেন শান্তির মা ঘরের মধ্যে কাঁদছে। শান্তি নেই, তার বাক্সের মধ্যে কাপড় ও দু-একখানা যা সোনার গহনা ছিল, তা নেই। ওদিকে দেখা গেল রামপ্রসাদও নেই।

আমি অবাক হয়ে বললাম—বল কি ?

সনাতনদা বললে—তোমার কাছে গাঁ শুদ্ধু সবাই আসছে শান্তির মাকে নিয়ে। এর কি করবে করো।

আমি বললাম—এর কিছু উপায় নেই সনাতনদা। শান্তি নিজের পথ নিজে করেছে। আপদ গেছে গাঁয়ের। এ নিয়ে কোনো গোলমাল হয় এ আমার ইচ্ছে নয়।

সুরবালা বললে—মেয়েমানুষকে চিনতে এখনও তোমার অনেক দেরি। শান্তি ঠাকুরঝিকে বড্ড ভাল মানুষ ভেবেছিলে না ?

বর্ষা নেমেছে খুব। দুজায়গায় ডাক্তারখানায় যাতাযাত, জলকাদায় সাইকেল চলে না—গরুর গাড়ী যেখানে চলে সেখানে গরুর গাড়ী, নয়তো নৌকো যেখানে চলে নৌকো। ছইয়ের বাইরে বসে দেখি বাঁকে বাঁকে পাড়-ভাঙা ডুমুর গাছ কিংবা বাঁশ ঝাড়ের নীচে বড় বড় শোলমাছ ঘোলা জলে মুখ উঁচু করে খাবি খাওয়ার মত ভাসছে, কোথাও ভুস্ করে ডুব দিলে মস্ত বড় কচ্ছপটা।

মঙ্গলগঞ্জের কুঠীঘাটে নৌকো বাঁধা হয়। নেমে যেতে হয় সিকি মাইল দূরে মঙ্গলগঞ্জের বাজারে—এখানেই আমার একটা শাখা ডাক্তারখানা আজ দুমাস হোল খুলেছি। সপ্তাহের

মধ্যে বুধবার আর শনিবার আসি। সনতনদা কোনো কোনো দিন আসে আমার সঙ্গে, কোনো দিন একাই আমি।

ডাক্তারখানা মঙ্গলগঞ্জের ক্ষুদ্র বাজারটির ঠিক মাঝখানে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে। এখানকার লোকের পীড়া-পীড়িতেই এখানে ক্লিনিক খুলেছি, নয়তো রোগীর ভিড় কোনোদিনই কম পড়েনি আমার গ্রামে। এখানেও লেখা আছে—সমাগত দরিদ্র রোগীগণকে বিনাদর্শনীতে চিকিৎসা করা হয়।

ডাক্তারখানায় পৌঁছুবার আগেই সমবেত রোগীদের কলরব আমার কানে গেল।

কম্পাউণ্ডার রামলাল ঘোষ দূর থেকে আমায় আসতে দেখে প্রফুল্লমুখে আবার ডিসপেন্সারি ঘরের মধ্যে ঢুকলো। আমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল অত ভিড় দেখে। ভেবেছিলাম, কাজ সেরে সকাল সকাল সরে পড়ব এবং সন্ধ্যার আগে বাড়ী পৌঁছে চা খেয়ে সনতনদার সঙ্গে বসে এক বাজি পাশা খেলবো, তা আজ হোল না দেখছি।

—কত লোক?

—প্রায় পঁয়ত্রিশজন ডাক্তারবাবু।

—গরুর গাড়ী?

—দু'খানা।

—মেয়ে রোগী?

—সাতজন।

—খাতা নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি করো—

রামালাল ঘোষ হেসে বললে—বাবু, তা হবে না। দুটো অপারেশনের রুগী।

অপ্রসন্ন মুখে বললাম—কি অপারেশন? কি হয়েছে?

—একজনের ফোঁড়া, একজনের হুইটলো।

—দূর, ওসব আবার অপারেশন? নরুন দিয়ে চেরা—তুমি আমায় ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। ডাক দাও সব জলদি জলদি—মেঘ আবার জমে আসছে। একটু চা খাওয়াবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় স্টোভটা তো জ্বালতেই হবে, জল গরমের জন্যে। আগে চা করে দিই।

এই সময় বাজারের বড় ব্যবসাদার জগন্নাথ কুণ্ডু এসে নমস্কার করে বললে—ডাক্তারবাবু, ভাল তো?

—নিশ্চয়ই, নয়তো এই দুর্যোগে কাজে আসি?

—একটা কথা। কিছু চাঁদা দিতে হবে। সামনের ঝুলনের দিন এখানে ঢপ দেবো ভাবছি।

—তা বেশ। কোথাকার ঢপ?

এখনো কিছু ঠিক করি নি। কেষ্টনগরের রাধারানী, রানাঘাটের গোলাপী কিংবা নদে শান্তিপুরের—

—আচ্ছা, আচ্ছা, যা হয় করবেন, আমার যা ক্ষমতা হয় দেবো নিশ্চয়ই। এখন কাজের ভিড়ের সময় বসে বসে বাজে গল্প করবার অবসর নেই আমার।

জগন্নাথ কুণ্ডু যাবার সময় বলে গেল—ওদিকে গিয়ে একবার কাজকর্ম দেখবেন টেকবেন, আপনারা দাঁড়িয়ে হুকুম দিলে আমরা কত উৎসাহ পাই।

অপারেশন শেষ করে নৌকোতে ওঠবার যোগাড় করছি, এমন সময় এক নূতন রোগী এল। তার কোমরে বেদনা আরও সব কি কি উপসর্গ। মুখ খিঁচিয়ে বলি—আজ আর হবে না, একটু আগে আসতে কি হয় ?

—বাবু, বাড়ীতে কেউ নেই। মোর ছোট ছেলেডা হাতে ধরে নিয়ে এল, তবে এ্যালাম ৷ একটু দয়া করুন—

আবার আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল, যা ভেবেছিলুম সেই সন্ধ্যেই নামলো। এ সময়ে অন্তত জঙ্গিপুরের ঘাট পেরুনো উচিত ছিল। নৌকোয় উঠে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। রুগীদের বিরক্তিকর এক ঘেয়ে বোকা বোকা কথা, স্টোভের ধোঁয়ার সঙ্গে মেশানো আইডোফরমের গন্ধ, ফিলটার থেকে জল পড়বার শব্দ, সামান্য কুইনিন ইনজেকসন করবার সময় চাষীদের ছেলেমেয়েদের বিকট চীৎকার যেন তাদের খুন করা হচ্ছে গলা টিপে—এ সব মানুষের কতক্ষণ ভাল লাগে ?

মাঝিকে বললাম—বাপু অভিলাষ, একটু বেশ নদীর মাঝখান দিয়ে চল, হাওয়া গায়ে লাগুক।

—বাবু, কঁদিপুরের বাঁওড়ের মুখে গলদাচিংড়ি মাছ নেবেন বললেন যে ?

—সে তো অনেক দূর এখনো। এটুকু তো চলো।

সারাদিনের পর যখন কাজটি শেষ করি তখন সত্যিই বড় আরাম পাই। মঙ্গলগঞ্জ থেকে ফেরবার পথে এ নৌকাভ্রমণ আমি বড় উপভোগ করি। সনাতনদা সঙ্গে থাকলে আরও ভাল লাগে। একা থাকলে বসে বসে দেখি, উঁচু পাড়ের গায়ে

গাঙ শালিকের গর্ত্ত, খড়ের বনের পাশে রাঙা টুক্‌টুকে মাকাল ফল লতা থেকে দুলছে, লোকে পটলের ক্ষেত নিরুচ্চে।

ভেবে দেখি, ভগবান আমায় কোনো কিছুর অভাব দেন নি। বাবা যা জায়গা জমি রেখে গিয়েছেন, তার আয় ভালোই, অন্তত ষাট-সত্তর ঘর প্রজা আছে আশে পাশের গাঁয়ে। আম কাঁটালের বড় বড় দুটো বাগান, তিনটে ছোট বড় পুকুর, পঁয়ত্রিশ বিঘে ধানের জমিতে যা ধান হয় তাতে বছরে চাল কিনতে হয় না। সুরবালার মত স্ত্রী। পাড়াগায়ে অত বড় বাড়ী হঠাৎ দেখা যায় না—অন্তত আমাদের এ অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে বেশি নেই। নিজে ভালো ডাক্তার, মেডিকেল কলেজের ভালো ছেলেই ছিলাম। কেষ্টনগরে কিংবা রানাঘাটে ডাক্তারখানা খুলতাম কিন্তু বাবা নিষেধ করেছিলেন। তখন তিনি বেঁচে, আমি সবে পাশ করেছি মাস দুই হোল। খুলনা জেলার জয়দিয়া গ্রামে আমার এক মাসীমা ছিলেন, তিনি আমাকে ছেলের মত স্নেহ করতেন, পরীক্ষা দিয়ে তাঁদের ওখানে মাস দুই গিয়ে ছিলাম। সেখানেই খবর গেল পাশের। বাড়ী ফিরতেই বাবা জিগ্যেস করলেন—কোথায় বসবে, ভাবলে কিছু?

—তুমি কি বল?

—আমি যা বলি পরে বলব, তোমার ইচ্ছেটা শুনি।

—আমি তো ভাবছি রানাঘাট কিংবা কেষ্টনগরে—

—অমন কাজও করো না।

—তবে কোথায় বল?

—এই গ্রামে বসবে। সেই জন্যে তোমাকে চাকরি করতে

দিলাম না, তুমি শহরে গিয়ে বসলে গাঁয়ের দিকে আর দেখবে না, এ বাড়ী ঘর কত যত্নে করা—সব নষ্ট হবে। অশথ গাছ গজাবে ছাদের কার্নিসে, আম কাঁটালের বাগান বারোভূতে খাবে। পৈত্রিক ভিটেয় পিদিম দেবার লোক থাকবে না। গাঁয়ের লোকও ভালো ডাক্তার চেয়েও পাবে না। এদের উপকার কর।

বাবার ইচ্ছার কোনো প্রতিবাদ করিনি। আমার অর্থের কোনো লালসা ছিল না। স্বচ্ছল গৃহস্থ ঘরের ছেলে, খাওয়া পরার কষ্ট কখনো পাইনি। গ্রামে থেকে গ্রামের লোকের উন্নতি করবো—এ ইচ্ছাটা আমার চিরকাল আছে—ছাত্রজীবন থেকেই।

গ্রামের লোকের ভালো করবো এই দাঁড়ালো বাতিক। এর জন্যে যে কত খেটেছি, কত মিটিং করে লোককে বুঝিয়েছি, পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করেছি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছি। গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি।

ঠিক সেই সময় একটি ঘটনা ঘটলো।

হরিদাস ঘোষের স্ত্রীর নামে নানা রকম অপবাদ শোনা গেল। বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী, স্বামী কলকাতায় ঘিয়ের দোকান করে, মাসে দু-একবার বাড়ী আসে কি-না সন্দেহ। পাশের বাড়ীর নিবারণ ঘোষের ভাইপোকে নাকি লোকে দেখেচে অনেক রাত্রে হরিদাসের ঘর থেকে বেরুতে। আমার কাছে রিপোর্ট এল। দুর্নীতির ওপর আমি চিরদিন হাড়ে চটা, মেয়েটিকে

কিছু না বলে নিবারণ ঘোষের ভাইপোকে একদিন উত্তম মধ্যম দেওয়া গেল। হরিদাস ঘোষকেও পত্র লেখা গেল। তারপর কিসে থেকে কি ঘটলো জানি নে, একদিন হরিদাসের স্ত্রীকে রান্নাঘরে ঘরের আড়া থেকে দোদুল্যমান অবস্থায় দেখা গেল। গোয়ালের গরুর দড়ি দিয়ে একাজ নিষ্পন্ন হয়েচে। তাই নিয়ে হৈ চৈ হোল, আমি মাঝে থেকে পুলিশের হাঙ্গামা মিটিয়ে দিলাম।

লোকের ভালো করতে গিয়ে অপবাদ কুড়ুতেও আমি পেছপাও নই। দুর্নীতিকে কোনো রকমে প্রশ্রয় দেবো না এ হোল আমার প্রতিজ্ঞা। এতে যা হয় হবে। বড় মুখুজ্যে মশায় গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ লোক। কোন মামলা মোকদ্দমা বাধলে মামলা মিটিয়ে দেবার জন্যে উভয় পক্ষ তাঁকে গিয়ে ধরতো। দু পক্ষ থেকে প্রচুর ঘুষ খেয়ে একটা যা হয় খাড়া করতেন। আমি ব্যবস্থা করলাম, পল্লীমঙ্গল সমিতির পক্ষ থেকে গ্রামের ঝগড়া বিবাদের সুমীমাংসা করে দেওয়া হবে, এজন্যে কাউকে কিছু দিতে হবে না। দু-একটা বিবাদ এভাবে মিটিয়েও দেওয়া গেল। মুখুজ্যে জ্যাঠামশায় আমার ওপর বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠেচেন শুনতে পেলাম। একদিন আমায় ডেকে বললে—শশাঙ্ক, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—আজ্ঞে বলুন জ্যাঠামশায় ?

—তুমি এসব কি করচো গাঁয়ে ?

—কি করচি বলচেন ?

—চিরকাল মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে সব ব্যাপারের মুজ্যো

মরেচে। তোমায় কাল দেখলাম ন্যাংটো হয়ে বেলতলা খেলে বেড়াতে, তুমি এ সবের কি বোঝো যে মামলার মীমাংসা করো? আর যদিই বা করলে তো নমস্কারী বলে কিছু আদায় করো। একদিন লুচি পাঁটা দিক ব্যাটারা। শুধু হাতে ও কাজে গেলে মান থাকে না বাপু। ওটা গ্রামের মোড়ল-মাতব্বরের হক পাওনা। দুটাকা জরিমানা করলে, একটাকা বারোয়ারি ফণ্ডে দিলে, একটাকা নিলে নিজের নজর। এই তো হোল বনেদি চাল। তবে লোকে ভয় করবে, নইলে যত ব্যাটা ছোটলোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে যে।

—আপনাদের কাল চলে গিয়েচে জ্যাঠামশায়। এখন আর ওসব করতে গেলে—

মুখুজ্যে জ্যাঠামশায়ের গলার শির ফুলে উঠলো উত্তেজনায়। চোখ বড় বড় হোল রাগে। হাত নেড়ে বললেন—কে বলেচে, চলে গিয়েচে? কাল এতটুকু চলে যায় নি। তোমরা যেতে দিচ্চ। কলেজে পড়া চোখে চশমা ছোকরা তোমরা, সমাজ কি করে শাসনে রাখতে হয় কি বুঝবে? সমাজ শাসন করবে, প্রজা শাসন করবে জুতিয়ে। তুমি থেকো না এর মধ্যে, শুধু বসে বসে ত্যাখো, আমার চণ্ডীমণ্ডপে বসে জুতিয়ে শাসন করতে পারি কি না।

আমি হেসে বললাম—সে জানি, আপনি তা পারেন জ্যাঠামশায়। কিন্তু আজকাল আর ওসব চলবে না।

মুখুজ্যে জ্যাঠা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললেন—আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে বসে শুধু ত্যাখো বাবাজি—

কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হোল যুগ সত্যিই বদলে যাচ্চে। নইলে কেউ কি কথনো শুনেচে তাঁর বড় ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট কোন এক অর্ব্বাচীন যুবক গ্রামের ও সমাজের মাতব্বর হয়ে দাঁড়াবে তিনি ছুচোখ বুজবার আগেই।

শুধু বললেন—এই আমতলার রাস্তা দিয়ে কেউ টেরি কেটে যেতে পারতো না। যাবার হুকুম ছিল না। একবার কি হোল জানো, গিরে বোষ্টমের ভাই নিতাই বোষ্টম গোবরাপুরের মেলা থেকে ফিরচে, ছুপুর বেলা, বেশ গুন্ গুন্ করে গান করতে করতে চলেচে, মাথায় টেরি। আমি বসে কাছারির নিকিশি কাগজ তৈরি করচি। বললাম—কে? তো বললে—আজ্ঞে, আমি নিতাই। যেমন সামনে আসা অমনি চটি না খুলে পটাপট্ দু ঘা পিঠে বসিয়ে দিয়ে বললাম—ব্যাটার হাতে পয়সার গোমর হয়েছে বুঝি? কাল নাপিত ডাকিয়ে চুল কদম ছাঁট ছেঁটে এখানে দেখিয়ে যাবি। তখন তা করে। রাশ রাখতে হোলে অমনি করতে হয়, বুঝলে?

আমি মুখুজ্যে জ্যাঠার কথার কোনো প্রতিবাদ করিনি। তিনি কিছু বুঝবেন না।

সেদিন চলে এলুম, কিন্তু বড় মুখুজ্যেমশায় মনে মনে হয়ে রইলেন আমার শত্রু। বড় ছেলে হারানকে বলে দিলেন, আমার বাড়ীতে যেন বেশি যাতায়াত না করে, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কয়। এমন কি নাতীর অন্নপ্রাশনের সময় আমাকে নিমন্ত্রণ করবার আগে একটি কথাও জানালেন

না। পাড়াগাঁয় সেটা নিয়ম নয়। কোনো ক্রিয়াকর্ম্মের সময় পাড়ার বিশিষ্ট লোকদের ডেকে কি করা উচিত বা অনুচিত সে সম্বন্ধে পরামর্শ করতে হয়, তাদের দিয়ে ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা করাতে হয়। সে সব কিছুই না। শুকনো নেমন্তন্ন করে গেল তাঁর মেজ জামাই। তাও অন্নপ্রাশনের দিন সকালে। একটা কথাও তার আগে আমায় কেউ বললে না।

সনাতনদা বললে—এর শোধ নিতে হবে ভায়া। আমরা সবাই তোমার দলে। তুমি যদি বল, এপাড়ার একটি প্রাণীও মুখুজ্যে বাড়ী পাত পাড়বে না।

—আমি তা বলচি নে। সবাই খাবে মুখুজ্যে জ্যাঠার বাড়ী।

সনাতনদা অবাক হয়ে বললে—এই অপমানের পরেও তুমি যাবে? না, না, তা আমরা হোতে দেবো না। আমার উপর ভার ছাও, ছাখো কোথাকার জল কোথায় মারি। কে না জানে ওঁর বংশে গোয়ালা অপবাদ আছে? ওঁর মেজ খুড়ী বিধবা হোয়ে ওই নিবারণ ঘোষের কাকা অধর ঘোষের সঙ্গে ধরা পড়েন নি?

—আঃ, কি বলচ সনাতনদা? ওসব মুখে উচ্চারণ কোরো না আর কেউ যদি নাও যায়—আমি খেতে যাবো।

—বেশ, তোমার ইচ্ছে গাঁয়ের লোক কিন্তু তোমার অপমানে খেপে উঠেছে।

—তাদের অসীম ধন্তবাদ। বাড়ী গিয়ে ডাবের জল খেয়ে ঠাণ্ডা হোতে বলো।

নিমন্ত্রণের আসরে ভিন্নগ্রামের ব লোকের সমাগম। দু-তিনটি চাকর অভ্যাগতদের পদধৌত করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করচে। মস্তবড় জোড়া সতরঞ্চি পড়েচে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায়। উঠোনজোড়া নীল সামিয়ানা টাঙানো। একপাশে দুটি নতুন জলভরতিত জালা, জালার মুখে পেতলের ঘটি, জালার পাশে একরাশ মাটির গেলাস।

আমায় ঢুকতে দেখে মুখুজ্যে জ্যাঠামশায় কেমন একটু অবাক হয়ে গেলেন। তখুনি সামলে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—আরে শশাঙ্ক যে! এসো এসো—

—একটু দেরি হয়ে গেল জ্যাঠাবাবু। রুগীপত্তর দেখে আসতে—

—ঠিক ঠিক, তোমার পশার আজকাল—

—আচ্ছা, আমি একবার রান্নাবান্নার দিকে দেখে আসি কি রকম হোল।

—যাও যাও, তোমাদেরই তো কাজ বাবা।

সেই থেকে বিষম খাটুনি শুরু করলাম। মাছের টুকরো কতবড় করে কাটা উচিত, চাটনিতে গুড় পড়বে না চিনি, বাইরের অভ্যাগতদের নিজের হাতে জলযোগ করানো, খাওয়ার জায়গা করা, বালতি হাতে মাছের কালিয়া ও পায়েস পরিবেশন, আবার এরই মধ্যে ভোজনতায় এক গেঁয়ো

ঝগড়া মেটানো। পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণভোজন বড় সাবধানের ব্যাপার, পান থেকে চুন খসলে এখানে অঘটন ঘটে। একজন নিমন্ত্রিতের পাতে নাকি মাছ পড়েনি—দুবার চেয়েচেন তিনি, তবুও কেমন ভুল হয়ে গিয়েচে। এত তাচ্ছিল্য সহ্য হয়? সে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ান আর কি! সামিয়ানার তলায় যত ব্রাহ্মণ খেতে বসেছিল সবাই হাত গুটিয়ে বসলে, কেউ খাবে না। ব্রহ্মণভোজন পণ্ড হবার উপক্রম হোল! ভোজ্যবস্তুর বালতি হাতে পরিবেশকেরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে।

আমি ছিলাম ভাঁড়ার ঘরে, একটা হৈ চৈ শুনে ছুটে বাইরে গেলাম। মুখুজ্যে জ্যাঠার ছেলে হারান হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে মাছের বালতি, আমায় দেখে বললে—একটু এগিয়ে যান দাদা—আপনি দেখুন একটু—

রণাঙ্গনে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। এর সামনে হাতজোড় করি, ওর সামনে মুখ কাঁচুমাচু করে মাপ চাই! মাছ?—কে দেয়নি মাছ? অর্ব্বাচীন যত কোথাকার। এই, এদিকে—নিয়ে এসো মাছের বালতি। যত সব হয়েচে—মানুষ চেনো না? রায়মশায়ের পাতে ঢালো মাছ। উনি যত পারেন, দেখছো না খাইয়ে লোক? খান, খান, আজকাল সব কেউ কি খেতে পারে? আপনাদের দেখলেও আনন্দ হয়। নিয়ে এসো, মুড়ো একটা বেছে এই পাতে। সন্দেশের বেলা এই পাত ভুলো না যেন। দয়া করে খান সব। আপনারা প্রবীণ, সমাজের

মাথার মণি, ছেলে-ছোকরাদের কথায় রাগ করে? ছিঃ, আপনারা হুকুম করবেন, আমরা তামিল করবো। খান।

দু-একজন ভিন্ন গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বললেন—এই তো! এতক্ষণ আপনি এলেই পারতেন ডাক্তারবাবু। কেমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা দ্যাখো তো! পেটে বিদ্যে থাকলে তার ধরনই হয় আলাদা।

হেঁকে বললাম—এদিকে মাছ নিয়ে এসো বেছে বেছে। মুড়ো দাও একটা এখানে—

যে বেশি ঝগড়াটে, তার পাতে মাছের মুড়ো দিয়ে ঠাণ্ডা করি। সামাজিক ভোজে মাছের মুড়ো দেওয়া হয় সমাজের বিশিষ্ট লোকদের পাতে। চাঁপাবেড়ের ঈশান চক্কত্তির পাতে কস্মিনকালে ভোজের আসরে মাছের মুড়ো পড়েনি—কারণ সে ঝগড়াটে ও মামলাবাজ হোলেও গরীব। সে আজ বাধিয়ে তুলেছিল এক কাণ্ড, ওর পাতে মাছের মুড়ো দেওয়ার দুর্লভ সম্মানে লোকটার রাগ একেবারে জল হয়ে গেল। আমার দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বললে—সন্দেশের সময় তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকো বাবাজি—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এই আমি দাঁড়ালাম, কোথাও যাচ্চি নে।

ভোজনপর্ব্ব সমাধানান্তে যে যার বাড়ী চলে গেল, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি ভাঁড়ার ঘর থেকে ডালঝোলদধিসন্দেশ মাখা হাতে ও কাপড়ে বেরিয়ে নিজের বাড়ী যেতে উদ্যত হয়েছি, মুখুজ্যে জ্যাঠা পেছন থেকে ডেকে বললেন—কে যায়?

—আজ্ঞে, আমি শশাঙ্ক।

—খেয়েচ ?

—আজ্ঞে না।

—কোথায় যাচ্চ তবে ? সোনা ফেলে আঁচলে গেরো ?

—সমস্ত দিনের ইয়ে—বাড়ী গিয়ে গা ধুয়ে—

—সে হবে না। গা এখানেই ধোও পুকুর ঘাটে। সাবান কাপড় সব দিচ্চে।

—আজ্ঞে তা হোক জ্যাঠামশায়। আমি বরং—

মুখুজ্যে জ্যাঠামশায় এসে আমার হাত ধরলেন। —তা হবে না বাবাজি, তুমি যাচ্চ খাবে না বলে, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি আজ আমার জাত রক্ষে করেছ—তুমি না থাকলে আজ ব্রহ্মণভোজন পণ্ড হয়েছিলো। খুব বাঁচিয়ে দিয়েচ বাবাজি। আমি তোমাকে আজ যে কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো, বেঁচে থেকো—দীর্ঘজীবী হও। চললে যে ?

—আমি যাই—

—কেন ?

—আপনি তো আমায় নেমন্তন্ন করেননি জ্যাঠাবাবু ?

আমার গলার মধ্যে একটু অভিমানের সুর এসে গেল কি ভাবে নিজের অলক্ষিতে।

মুখুজ্যে জ্যাঠামশায় কাতরভাবে আমার হাত দুটো ধরে বললেন—আমার মতিচ্ছন্ন। রত্ন চিনতে পারিনি। তুমি আমার কানটা মলে দাও—দাও বাবাজি—

আমি জিভ কেটে হাত জোড় করে বিনীতভাবে বলি—ও কি কথা জ্যাঠামশায় ? আমি আপনার ছেলের বয়সী, আমাকে ও কি কথা !

—বেশ, চলো আমার সঙ্গে। পুকুরে নাইবে, সাবান দিচ্চি। তোমাকে না খাইয়ে আমি জলস্পর্শ করবো না। চলো—

সনাতনদা সেই রাত্রেই আমার বৈঠকখানায় এল। বললে—খুব ভায়া, খুব ! দেখালে বটে একখানা !

—কি রকম ?

—আজ তো উলটে গিয়েছিল সব ! তুমি এসে না সামলালে—খুব বাঁচান বাঁচিয়েচ।

আমার কেমন সন্দেহ হোল, আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—তোমার কাজ, সনাতনদা ?

—কে বললে ?

—তুমি ওদের উসকে দিয়েচ ? ঈশান চক্কত্তিকে তুমি খাড়া করেছিল ?

—হ্যাঁ আমি না হুতো—

—ঠিক তুমি। আমি নাড়ী টিপে খাই তা তুমি জানো ? বলো, হ্যাঁ কি না ?

সনাতনদা মুখ টিপে হাসতে লাগলো। বললে—তা তোমার অপমান তুমি তো গায়ে মাখলে না—আমাদের একটা কিছু বিহিত করতে হয় ? তবে হ্যাঁ—দেখালে বটে ! তুমি অন্য ডালের আম, আমাদের মত নও। যারা যারা জানে, সবাই

দেখে অবাক হয়ে গিয়েচে। আবার কেউ কেউ বোকাও বলছে।

আমি তিরস্কারের কড়াসুরে বললাম—এমন করে আমার উপকার করবে না সনাতনদা, অনিষ্টই করবে ; আমি তোমাদের দলাদলির মাথায় ঝাড়ু মারি। আমি ওসবের উচ্ছেদ করবো বলেই চেষ্টা করচি। এতে যে আমার দলে থাকবে থাকো, নয়তো দূর হয়ে চলে যাও—গ্রাহ্যও করি নে। কুচক্কুরেপনা যদি না ছাড়তে পারো—আমার সঙ্গে আর মিশো না।

সনাতনদা খুব দমে গেল কিন্তু সেটা চাপবার চেষ্টায় সহাস্য সুরে বললে—হয়েচে নাও, নাও। লেকচার মেকচার রাখো, একটু চা করতে বলে দাও দিকি বৌমাকে।

মঙ্গলগঞ্জ ডিসপেনসারির কাজ সেরে বার হয়েচি সেদিন সকাল সকাল বাড়ী ফিরবো, নৌকা বাঁধা রয়েচে বাজারের ঘাটে, এমন সময় ভূষণ দা এসে বললে—আজ যাবেন না ডাক্তারবাবু, আজ যে ঝুলনের বারোয়ারি—

—কখন ?

একটু অপেক্ষা করতে হবে, সন্দের পর আলো জ্বেলেই আসর লাগিয়ে দোবো।

—যাত্রা ?

—না ডাক্তারবাবু, আজ খেমটা। ভালো দল এসেচে একটি। কেষ্টনগরের। অনেক কষ্টে সুপারিশ ধরে তবে বায়না বাবা।

আমার তত থাকবার ইচ্ছে নেই। খেমটা নাচ দেখবার আমি পক্ষপাতী নই, তবুও ভাবলাম এ সব অজ পাড়াগাঁয়ে আমোদ-প্রমোদের তেমন কিছু ব্যবস্থা নেই, আজ বরং একটু থেকে দেখেই যাই। অনেকদিন কোন কিছু দেখিনি। একঘয়ে ভাবে ডাক্তারিই করে চলচি।

এ সব জায়গায় খেমটা নাচওয়ালীদের বিশেষ খাতির, সেটা আমি জানি। বাজার শুদ্ধ মাতব্বর লোকেরা স্টেশনে যায় খেমটার দলের অভ্যর্থনা করতে। ওদের বিশ্বাস, খেমটা-ওয়ালীরা সবাই সুশিক্ষিতা ভদ্র ও শহুরে মেয়ে, তারা এ পাড়াগাঁয়ে এসে কোনোরকম দোষ না ধরে, আদর যত্ন ও ভদ্রতার কোন খুঁৎ না বের করে ফেলে। ভূষণ দাঁ সব সময় হাত জোড় করে ওদের সামনে ঘুরচে কখন কি দরকার হয় বলা তো যায় না! শ্রীশ দাঁর আড়তে খেমটার দলের জায়গা দেওয়া হয়েচে—এ গ্রামের মধ্যে ঐটিই সব চেয়ে বড় আর ভাল বাড়ী।

সনাতনদা আসলে আজ বেশ হোত। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে, গল্প-গুজব করবার লোক থাকলে আনন্দে কাটে। বর্ষাকাল হোলেও আজ দুদিন বৃষ্টি নেই। মঙ্গলগঞ্জের ঘাটের উপরেই একটা কদম গাছে থোকা থোকা কদম ফুল ফুটেচে। সজল মিঠে বাতাস, এখানে বৃষ্টি না হলেও অন্য কোথাও বৃষ্টি হয়েচে।

নেপাল প্রামাণিকের তামাকের দোকান বাজারের ঘাটের কাছেই। আমাকে একা বসে থাকতে দেখে সে এল।

বললাম—নেপাল, একটু চা খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারো ?

নেপাল তটস্থ হয়ে পড়লো। —হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি করে নিয়ে আসছি দোকান থেকে।

আমি বললাম—খেমটা আরম্ভ হতে কত দেরি ?

—সন্দের পর হবে ডাক্তারবাবু। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা করবো ?

—না, না, শুধু চা করো। আমার এখানেই হবে, স্টোভ আছে, সব আছে, কেবল দুধ নেই।

—দুধ আমি বাড়ী থেকে আনছি। খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে কষ্ট হবে আপনার। কখন খেমটা শেষ হবে, তখন বাড়ী যাবেন—সে অনেক দেরি হয়ে যাবে। খাবেন কখন ? সে হয় না।

এখানকার বাজারের মধ্যে ভূষণ দাঁ ও নেপাল প্রামাণিক—এরা সব মাতব্বর লোক। ওরাই চাঁদা ওঠায়, বারোয়ারির আয়োজন করে বছর বছর। পাঁচজনে শোনেও ওদের কথা। আমি যখন এখানে ডাক্তারখানা খুলেচি, সকলকেই সন্তুষ্ট রাখতে হবে আমার। সুতরাং বললাম—তবে তুমি কি করতে চাও ?

খানকতক পরোটা ভাজিয়ে আনি আর একটু আলুর তরকারি।

—তার চেয়ে ডাক্তারখানার স্টোভে দুটি ভাত চড়িয়ে দিক আমার কম্পাউণ্ডার।

—সে অনেক হাঙ্গামা। কোথায় হাঁড়ি, কোথায় বেড়ি কোথায় চাল, কোথায় ডাল!

একটু পরে নেপাল চা করে নিয়ে এল, তার সঙ্গে চাল-ছোলা ভাজা। আমি বললাম—তুমিও বসো, এক সঙ্গে খাই।

নেপাল বসে বসে নানারকম গল্প করতে লাগলো। ওর জীবনটা বেশ। শোনবার মত জিনিস সে গল্প। এ সব বাদলার বিকেলে চালছোলা ভাজার সঙ্গে মজে ভাল।

বললাম—নেপাল, দুটি বিয়ে করলে কেন এক সঙ্গে?

—একসঙ্গে তো করিনি, এক বছর পর পর।

—কেন?

—প্রথম পক্ষের বৌ আমাকে না বলে বাপের বাড়ী পালিয়ে গেল, সেই রাগে তাকে ত্যাগ করবো বলে যেই দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছি, অমনি প্রথম পক্ষের বৌও সুড় সুড় করে এসে ঢুকলো সংসারে। আর নড়তে চাইলে না, সেই থেকেই আছে। দুজনেরই ছেলেমেয়ে হচ্চে। এখন মনে হয়, কি বকমারিই করেছি, তখন অল্প বয়স, সে বুদ্ধি কি ছিল ডাক্তার-বাবু? এখন পাঁচ পাঁচটা মেয়ে, কি করে বিয়ে দেবো সেই ভাবনাতেই শুকিয়ে যাচ্ছি—আর একটু চা করি?

—বেশ।

দুজনেই সমান চা-খোর। রাত আটটা বাজবার আগে আমাদের দু-তিন বার চা হয়ে গেল। নেপাল বসে বসে অনেক সুখ দুঃখের কাহিনী বলে যেতে লাগলো। কোন্ পক্ষের বৌ ওকে ভালবাসে, কোন্ বৌ তেমন ভালবাসে না—এই সব গল্প।

—প্রথম পক্ষের বৌটা সত্যিই ভালো। সত্যিই ভালবাসে। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলাম বটে কিন্তু ও আমার ওপর রাগ করেনি।

—ছোটবউ কেমন?

—ওই অমনি এক রকম। সুবিধে না।

—কেন?

—তেমন আঁটা নেই কারো ওপর। আমার ওপরও না। থাকতে হয় তাই থাকে, সংসার করতে হয় তাই করে।

—দেখতে কে ভালো?

—বড়বৌ।

এমন সময় ভূষণ দাঁ নিজে এসে জানালে আসর তৈরি হয়েচে, আমি যেন এখুনি যাই।

নেপাল প্রামাণিক বললে—ডাক্তারবাবু, আপনার খাবার কি ব্যবস্থা হবে?

—খেমটা দেখে চলে যাবো বাড়ীতে। গিয়ে খাবো।

—খেমটা ভাঙ্গতে রাত একটা। আপনার বাড়ী পৌঁছুতে রাত সাড়ে তিনটে। ততক্ষণ না খেয়ে থাকবেন? তার চেয়ে একটা কথা বলি।

—কি?

—বলতে সাহস হয় না। চলুন, আমার বাড়ী। বড় বৌকে বলেই এসেচি, আমি খেতে যাবার সময় সে আপনার জন্যে পরোটা ভেজে দেবে। আর যদি না যান, আমি কলাপাতে মুড়ে পরোটা ক'খানা এখানেই নিয়ে আসবো এখন।

—ওসব দরকার নেই, আর একবার চা খেলেই আমার ঠিক হয়ে যাবে।

—চাও করবো এখন আপনার স্টোভে। তার আর ভাবনা কি? চা যতবার খেতে চান, তাতে দুঃখ নেই। আপনি বসবেন, না, আসরে যাবেন ?

আসরে গিয়ে বসলাম। নিতাই শীলের কাপড়ের দোকান ও হরি ময়রার সন্দেশ মুড়কির দোকানের পিছনে যে ফাঁকা জায়গা, ওখানটায় পাল খাটানো হয়েচে। তার তলায় বড় আসর। আসরের চারিদিকে বাঁশের রেলিং। চাষাভূষো লোকের জন্যে আসরের বাইরে দরমা পাতা, ভেতরে বড় সতরঞ্চি ও মাদুর বিছানো। চার-পাঁচটা বড় বড় ঝাড় ও বেল ঝুলচে, দুটো হ্যাজাক লণ্ঠন। মোটের উপর বেশ আলো ফুটেচে আসরে। আমি যখন গেলুম, তখন খেমটা নাচ আরম্ভ হয়েচে।

একপাশে খান কতক চেয়ার বেঞ্চি পাতা, স্থানীয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্যে। আমাকে সবাই হাত ধরে খাতির করে চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসালে।

পাশে বসে আছে মঙ্গলগঞ্জ ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রামহরি সরকার—পাশের গ্রামে বাড়ী, জমিজমাযুক্ত পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ। পেটে 'ক' অক্ষর নেই, ধূর্ত্ত ও মামলাবাজ। তার সঙ্গে বসেচে গোবিন্দ দাঁ, ভূষণ দাঁর জ্যেঠতুতো ভাই—কলিকাতায় ক্লাইভ স্ট্রীটে রংয়ের দোকান আছে, পয়সাওয়ালা, মূর্খ ও কিছু অহংকারী। সে নিজেকে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদারদের একজন বলে গণ্য করে, এখানে পাড়াগাঁয়ে এসে

এই সব ছোট গানের আসরে ছোটখাটো ব্যবসাদারদের সঙ্গে দেমাকে নাক উঁচু করে বসেছে। আমায় সে চেনে, একবার ওর ছোট নাতীর ঘুংড়ি কাসির চিকিৎসা করেছিলাম এই মঙ্গলগঞ্জে আর বারে। ওর ওপাশে বসেচে কুঁদিপুর গ্রামের আবছুল হামিদ চৌধুরী, ঐ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও লোকাল-বোর্ডের মেম্বার। আবছুল হামিদের বাড়ী একচল্লিশ গোলা ধান, এ অঞ্চলের বড় ধেনো মহাজন, দশ-পনেরোখানা গ্রামের কৃষক সব আবছুল হামিদের খাতক প্রজা। তার পাশে বসে আছে কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, জাতে কলু, তিনপুরুষে ব্যবসাদার। হাতে আগে যত টাকা ছিল, এখন তত নেই, সরষের ব্যবসায়ে ক'বার ধরে লোকসান দিয়ে অনেক কমে গিয়েচে। প্রহ্লাদ সাধুখাঁর ভাই নরহরি সাধুখাঁ তার ডানপাশেই বসেচে। নরহরি এই মঙ্গলগঞ্জে ধানপাটের আড়তদারি করে।

গোবিন্দ দাঁ পকেট থেকে একটি সিগারেট বার করে বললে—আসুন ডাক্তারবাবু!

—ভাল আছেন ?

—বেশ আছি। আপনি ?

—মন্দ নয়।

—এ পাড়াগাঁ ছেড়ে আর কোথাও জায়গা পেলেন না ? কতবার বললাম।

—আপনাদের মত বড়লোক তো নই। অন্য জায়গায় গেলে চলতে পারে কি ? কি রকম চলচে আপনাদের ব্যবসা ?

—আগের মত নেই, তবুও এরকম মন্দ নয়।

আবছুল হামিদ চৌধুরী বললে—কতক্ষণ এলেন ডাক্তারবাবু?

—তা ছুপুরের পরই এসেচি। এতক্ষণ চলে যেতাম, ভূষণ দাঁ গিয়ে ধরলে গান না শুনে যেতে পারবো না। ভালো সব?

—খোদার ফজলে একরকম চলে যাচ্চে। আমাদের বাড়ীতে একবার চলুন।

—আমি ডাক্তার মানুষ, বাড়ীতে নিয়ে গেলেই ভিজিট দিতে হবে, জানেন তো?

—ভিজিট দিতে হয়, ভিজিট দেওয়া যাবে। একদিন গিয়ে একটু ছুধ খেয়ে আসবেন।

কলাধরপুরের প্রহ্লাদ সাধুখাঁ হেসে বললে—সে ভাল তো ডাক্তারবাবু। ট্যাকাও পাবেন, আবার ছুধও খাবেন। আপনাদের অদেষ্ট ভাল। যান, যান—

রামহরি সরকার এতক্ষণ কথা বলবার ফাঁক পাচ্ছিল না, সেও একজন যে-সে লোক নয়, মঙ্গলগঞ্জ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পাড়াগাঁ অঞ্চলে এ সব পদে যারা থাকে, তারা নিজেদের এক একজন কেষ্টবিষ্টু বলে ভাবে, উন্নাসিক আভিজাত্যের গর্ব্বে সাধারণ লোক থেকে একটু দূরে রাখে নিজেকে।

রামহরি এই সময় বললে—ডাক্তার আর এই গিয়ে পুলিশ, এদের সঙ্গে ভাব রাখাও দোষ, না রাখাও দোষ। পরশু আমার বাড়ি হঠাৎ বড় দারোগা এসে তো ওঠলেন। তখুনি পুকুর থেকে বড় মাছ তোলালাম, মাছের ঝোল ভাত হোল।

আবছুল হামিদ চৌধুরীর মনে কথাটা লাগলো। সেও তো বড় কম নয়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং লোকাল বোর্ডের

মেম্বার, পুলিশ কি শুধু রামহরি সরকারের বাড়ীতেই আসে, তার ওখানেও আসে। সুতরাং সে বললে—ও তো আমার বাড়ী দুবেলা ঘটচে। সে দিন বড়বাবু আর মেজবাবু একসঙ্গে এ্যালেন আশুডাঙা খুনী কেসের এন্‌কোয়ারী সেরে। দুপুর বেলা. ভাত খেয়ে চক্ষু একটু বুজেচি, দুই ঘোড়া এসে হাজির। তখুনি খাসি মারা হোল একটা, সরু চালের ভাত আর খাসির মাংস হোল।

রামহরি বললে—রাঁধলে কে ?

—ওই দোবেজি বলে এক কনেস্টবল আছে না ? সে-ই রাঁধলে।

—মাংস রাঁধলে দোবেজি ?

—না, মাংস রাঁধলেন বড়বাবু নিজে। ভাল রসুই করেন।

গোবিন্দ দাঁর ভাল লাগছিল না এ সব কথা, সে যে বড় তা দেখানোর ফুরসত সে পাচ্চে না। এরা তো সব পাড়াগাঁয়ে প্রেসিডেণ্ট। এরা পুলিশকে খাতির করলেও সে থোড়াই কেয়ার করে। খাস কলকাতা শহরে ব্যবসা তার, সেখানে শুধু ওরা জানে লাট সায়েবকে আর পুলিশ কমিশনারকে।

গোবিন্দ বললে—পুলিশের হ্যাপা আমাদেরও পোয়াতে হয়। সেবার হলো কি, আমরা হ্যাবাক জিংকের পিপে কত-গুলো রেখেচি দালানে, তাই সার্চ্চ করতে পুলিশ এল।

আমি বললাম—কিসের পিপে ?

—হ্যাবাক জিংকের পিপে। ব্যাপারটা কি জানেন, বিলিতি হ্যাবাক জিংকের হন্দর সাড়ে উনিশ টাকা, আর সেই জায়গায়

জাপানী জিংকের হুন্দর সাড়ে সাত টাকা। আমরা করি কি, আপনার কাছে বলতে দোষ কি—বিলিতি হ্যাবাক জিংকের খালি পিপে কিনে তাতে জাপানী মাল ভরতি করি।

—কেউ ধরতে পারে না?

—জিনিস চেনা সোজা কথা না। ও ব্যবসার মধ্যে যারা আছে, তারা ছাড়া বাইরের লোকে কি চিনবে? চেনে মিস্ত্রিরা, তাদের সঙ্গে—

গোবিন্দ দুই আঙ্গুলে টাকা বাজাবার মুদ্রা করলে।

প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কথাটা মন দিয়ে শুনছিল, লাভের গন্ধ যেখানে, সেখানে তার কান খাড়া হয়ে উঠবেই, কারণ সে তিনি-তিন পুরুষে ব্যবসাদার। সে বললে—বলেন কি দাঁ মশায়, এত লাভ? গোবিন্দ ধূর্ত্ত হাসির আভাস মাত্র মুখে এনে গলার সুরকে ঘোরালো রহস্যময় করে বললে—তা নইলে কি আজ কলকাতা শহরে টিকতে পারতাম সাধুখাঁ মশাই? আমার দোকানের পাশে ডি. পাল এ্যাণ্ড সন্—লক্ষপতি ধনী, টালা থেকে টালিগঞ্জ এস্তোক আঠারোখানা বাড়ী ভাড়া খাটচে, বড়বাবু মেজবাবু নিজের নিজের মোটরে দোকানে আসেন, সে মোটর কি সাধারণ মোটর? দেখবার জিনিস। তাদের বলা যায় আসল বড়বাবু মেজবাবু। মেয়ের বিয়েতে সতেরো হাজার টাকা খরচ করলে। মোটর গাড়ী থেকে নেমে আমার দোকানে এসে হাতজোড় করে নেমন্তন্ন করে গেলেন। আসল বড়বাবু মেজবাবু তাঁদের বলা যেতে পারে। নইলে আর সব—হুঁ—

আবদুল হামিদ চৌধুরী পুলিশের দারোগাদের বড়বাবু ছোট-

বাবু বলে ছিল একটু আগে। সে এ বক্রোক্তি হজম করবার পাত্র নয়। বললে—তা আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ, আমাদের কাছে ওঁরাই আসল বড়বাবু, মেজবাবু। এখানে তো আপনার কলকাতার বাবুরা আসলেন না মুশকিলের আসান করতে? এখানে মুশকিলের আসান করবে পুলিশই।

প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কুঁদিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বাস করে, সুতরাং ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট আবদুল হামিদ চৌধুরীকে তুষ্ট রাখায় তার স্বার্থ আছে। সে আবদুল হামিদকে সমর্থন করে বললে—ঠিক বলেচেন মৌলবী সাহেব, ঠিক বলেচেন। কলকাতার বাবুদের কি সম্পর্ক?

গোবিন্দ দাঁ বললে—সে কথা হচ্চে না। আসল বড়লোকের কথা হচ্চে। তোমার এখানে যদি চুনোপুটি মাছের টাকা টাকা সের হয়, তবে কি পুঁটি মাছের কদর রুই মাছের সমান হবে? পাড়াগাঁয়ে সব সমান, বলে, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। ডাক্তারবাবু কি বলেন?

এই সময় আমার চোখ পড়লো আসরের দিকে, দুটি সুসজ্জিতা ঘোমটাওয়ালী লঘু পদবিক্ষেপে আসরে ঢুকলে। একটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়, বরং বেশি। সমস্ত গায়ে গহনা, গিল্টির কি সোনার, বোঝাবার উপায় নেই। গায়ের রংয়ের জলুস অনেকটা কমে এসেচে। ওর পেছনে যে মেয়েটি ঢুকলো তার বয়েস কম, ষোল কি সতেরো কিংবা অতও নয়, শ্যামাঙ্গী, চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও দুষ্টুমির দীপ্তি, অত্যন্ত আঁটসাঁট বাঁধুনি, সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোথাও ঢিলেঢাল নেই,

মুখশ্রী সুন্দর, সব চেয়ে দেখবার জিনিস তার মাথার ঘন কালো চুলের রাশ—মনে হয় সে চুল ছেড়ে দিলে যেন হাঁটুর নীচে পড়বে। এর গায়ে তত গহনার ভিড় নেই, নীল রংয়ের শাড়ী ও কাঁচুলি চমৎকার মানিয়েচে নিটোল গড়ন দেহটিতে।

ওরা নাচ গান আরম্ভ করেচে।

বড় মেয়েটি নাচতে নাচতে আমাদের কাছে আসচে, কারণ সে বুঝেচে এই চাষাভুষোর ভিড়ের মধ্যে আমরাই সম্ভ্রান্ত। সে মেয়েটা বার বার এসে আমাদের কাছে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচতে লাগলো।

আবদুল হামিদ চৌধুরী দুটাকা প্যালা দিলে। প্যালা দিয়ে সে সগর্ব্বে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। গোবিন্দ দাঁ সেটা সহ্য করতে পারলে না, পাড়াগায়ের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কি তাদের মত শাঁসালো ব্যবসাদারের কাছে লাগে? থাকলোই বা বাড়ীতে একচল্লিশটা ধানের গোলা। অমন ধেনো মহাজনকে ক্লাইব স্ট্রীট ও রাজা উডমণ্ট স্ট্রীটের রং ও হার্ডওয়ারের বাজারে এবেলা কিনে ওবেলা বেচতে পারে, এমন বহুৎ ধনী সওদাগর তার দোকানে এসে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন করে যায়।

গোবিন্দ দাঁ একটা রুমালে দুটি টাকা বেঁধে ঘোমটাওয়ালীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

আমি এ পর্য্যন্ত কিছু দিই নি, শেষ পর্য্যন্ত যখন কৃপণ প্রহ্লাদ সাধুখাঁও একটা টাকা প্যালা দিয়ে ফেললে, তখন আমার কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগলো। না দিলে এই

সব অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ে লোক, যারা নিজেদের যথেষ্ট গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত বলে ভাবে, তারা আমার দিকে কৃপার চোখে চাইবে। এরা ভাবে খেমটার আসরে বসে খেমটাওয়ালীকে প্যালা দেওয়াটা খুব একটা ইজ্জতের কাজ বুঝি। এ নিয়ে আবার এদের আড়াআড়ি ও বাদাবাদি চলে। এক রাত্রে আসরে বসে বিশ-চল্লিশ টাকা প্যালা দিয়ে ফেলেচে ঝোঁকের মাথায়, এমন লোকও দেখেচি।

এবারে নাচওয়ালিটি আমার কাছে এসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে লাগলো :

ও সই পিরিতির পয়সা নিয়ে ঘুরে মরি দেশ বিদেশে—

আমারই সামনে এসে বার বার গায়, ভাবটা বোধ হয় এই, সবাই দিচ্ছে তুমি দেবে না কেন? আমার পকেটে আজকার পাওনা দশ বারোটি টাকা রয়েচে বটে, কিন্তু আমি ভাবছি, ওদের দেখাদেখি আমি যদি এই নর্ত্তকীদের পাদপদ্মে এতগুলো টাকা বিসর্জ্জন দিই তবে সে হবে ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ।

এই সময় আমার নাকের কাছে রুমাল ঘুরিয়ে আবদুল হামিদ চৌধুরী আবার দুটাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলে খেমটাওয়ালীর দিকে। দেখাদেখি আরও দু-তিন জন প্যালা দিলে এগিয়ে গিয়ে।

এইবার সেই অল্প বয়সী নর্ত্তকীটি আমার কাছে এসে গান গাইতে লাগলো। বেশি বয়সের মেয়েটিই ওকে আমার সামনে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলে, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। ও তো হার মেনে গেল, এ যদি সফল হয় কিছু আদায় করতে।

আমি প্রথমটা ও মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখিনি। এখন খুব কাছে আসতে ভাল করে চেয়ে দেখলাম যে বেশ দেখতে। রং ফরসা নয় বটে কিন্তু একটি অপূর্ব্ব কমনীয়তা ওর সারা দেহে। ভারী চমৎকার বাঁধুনি শরীরের। যতবার আমার কাছে এল, ওর ঢল ঢল লাবণ্য ভরা মুখ ও ডাগর কালো চোখ দুটি আমার কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠতে লাগলো। গলার সুরও কি সুন্দর, অমন কণ্ঠস্বর আমি কখনো শুনিনি কোনো মেয়ের।

আমাদের গ্রামে শান্তি বেশ সুন্দরী মেয়ে বলে গণ্য, কিন্তু শান্তি এর পায়ের নখের কাছে দাঁড়াতে পারে না।

আবার মেয়েটি ঠিক আমার সামনে এসেই গান গাইতে লাগলো। আমার দিকে চায়, আবার লজ্জায় মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়, আবার আমার দিকে চায়—সে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি। আমার মনে হোল, এখনো ব্যবসাদারি শেখেনি মেয়েটি, শুধু অন্য নর্ত্তকীটির শিক্ষায় ও এমনি করচে। বোধ হয় তাকে ভয় করেও চলতে হয়।

হঠাৎ কখন পকেটে হাত দিয়ে দুটি টাকা বার করে আমি সলজ্জ ও সকুণ্ঠভাবে মেয়েটির সামনে রাখলাম। মেয়েটি আমায় প্রণাম জানিয়ে টাকা দুটি তুলে নিলে।

গোবিন্দ দাঁ ও আবদুল হামিদ চৌধুরী একসঙ্গে বলে উঠলো —বলিহারি!

আরও দুবার মেয়েটি আমার কাছে ঘুরে ঘুরে গেল। আমি দুবারই তাকে টাকা দেবার জন্যে তুলেও আবার পকেটে ফেললাম। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগলো, দিতে পারলাম না পাছে

আবদুল হামিদ কি গোবিন্দ দাঁ কিংবা প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কিছু মনে করে। কিন্তু কি ওরা মনে করবে, কেন মনে করবে, এসব ভেবেও দেখলাম না।

আবদুল হামিদ আমায় একটা সিগারেট দিলে, অন্যমনস্ক ভাবে সেটা ধরিয়ে আবার নাচের দিকে মন দিলাম। অনেক

আমার মন যেন কেমন চঞ্চল। কিছু ভাল লাগচে না। কোথাও রাত কাটাতে আমার ইচ্ছে নেই। মাঝিকে নিয়ে সেই রাত্রেই নৌকা ছাড়লাম। গভীর রাত্রের সজল বাতাসে একটু ঘুম এল ছইয়ের মধ্যে বিছানায় শুয়ে। সেই অল্প বয়সী মেয়েটি আমার চোখের সামনে সারা রাত নাচতে লাগলো। এক একবার কাছে এগিয়ে আসে, আমি রুমাল বেঁধে প্যালা দিতে যাই, সে তখুনি হেসে দূরে সরে যায়, আবার কিছুক্ষণ পরে কাছে এগিয়ে আসে।

রাত্রে নাচ বন্ধ হোল। গোবিন্দ দাঁ বললে—ডাক্তারবাবু, বাকী রাতটুকু গরীবের বাড়ীতেই শুয়ে থাকুন, রাত বেশি নেই, সকালে চা খেয়ে—

মাঝির ডাকে ঘুম ভাঙলো। মাঝি বলচে—উঠুন বাবু, নৌকা ঘাটে এয়েচে।

উঠে দেখি ওপারের বড় শিমূল গাছটার পিছনে সূর্য্য উঠেছে বেলা হয়ে গিয়েচে। দীনু বাড়ুই ঘাটের পাশে জেলে ডিঙিতে বসে মাছ ধরচে, আমায় দেখে বললে—ডাক্তারবাবু রাত্তিরি ডাকে গিয়েছিলেন? কমেকার রুগী?

পরদিন মঙ্গলগঞ্জে যাবার দিন নয়।

সুরবালা বললে—ওগো আজ ও পাড়ার অধিক ঠাকুরপোর মেয়েকে দেখতে আসবে। তোমাকে সেখানে থাকতে বলেচে।

আমি বললাম—আজ আমার থাকা হবে না। মঙ্গলগঞ্জে যেতে হবে।

—কেন, আজ আবার সেখানে ? শক্ত রুগী আছে বুঝি ?

—না। ওদের বারোয়ারি লেগেচে। আমি না থাকলে চলবে না।

মনে মনে কিন্তু বুঝলাম, কথাটা খাঁটি সত্যি নয়। আমার সেখানে না থাকলে খুব চলবে। ওদের আছে প্রেসিডেণ্ট রামহরি সরকার, ক্লাইভ স্ট্রীটের রংয়ের দোকানের মালিক গোবিন্দ দাঁ, কলাধরপুরের প্রহলাদ সাধুখাঁ কুঁদিপুরের প্রেসিডেণ্ট আবদুল হামিদ চৌধুরী, আরও অনেকে। আমাকে ওরা যেতেও বলেনি।

এই বোধ হয় জেনে শুনে প্রথম মিথ্যা কথা বললাম সুরবালাকে।

আমায় যেতে হবে কেন তা নিজেও ভাল জানিনে।

মনে ভাবলাম—নাচ জিনিসটা তো খারাপ নয়! ওরা সবাই মিলে খারাপ করেচে। দেখে আসি না, এতে দোষটা আর কি আছে ? সকালে সকালে চলে আসবো।

রাম্ন পাড়ুই আজও জিজ্ঞাসা করলে—বাবু, রুগী দেখতে চললেন বুঝি ?

ওর প্রশ্নে আজ যেন বিরক্ত হয়ে উঠি। যেখানেই যাই না

কেন তোর তাতে কি রে বাপু? তোকে কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে না কি? মুখে অবিশ্যি কিছু বললাম না।

মাঝিকে বললাম—একটু তাড়াতাড়ি বাইতে কি হচ্চে তোর? ওদিকে আসর যে হয়ে গেল—

খেমটার প্রথম আসরেই আমি একেবারে সামনে গিয়ে বসলাম। আবদুল হামিদ আজও আমার পাশে বসেছে। অন্যান্য সব বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যারা কাল উপস্থিত ছিল, আজও তারা সবাই রয়েচে, যেমন, প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, ওর ভাই নরহরি সাধুখাঁ, গোবিন্দ দাঁ, ইত্যাদি। আমি যেতেই সবাই কলরব করে উঠলো—আসুন, ডাক্তারবাবু, আসুন।

আবার সেই অল্প বয়সী মেয়েটি ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসে হাজির হোতেই আমি দুটি টাকা প্যালা দিয়ে দিলাম সকলের আগে। পকেট ভরে আজ টাকা নিয়ে এসেছি প্যালা দেওয়ার জন্যে। আবদুল হামিদ যে আমার নাকের সামনে রুমাল ঘুরিয়ে প্যালা দেবে, তা আমার সহ্য হবে না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

আবদুল হামিদের চোখে বড় হবার জন্যেই কি পকেট পুরে টাকা এনেছি প্যালা দেবার জন্যে?

নিজের কাছেই নিজের মনোভাব খুব স্পষ্ট নয়।

আবদুল হামিদ আমার দেখাদেখি দুটাকা প্যালা দিলে।

আমার চোখ তখন কোনো দিকে ছিল না। আমি এক দৃষ্টে সেই অল্প বয়সী মেয়েটিকে দেখচি। কি অপূর্ব্ব ওর মুখশ্রী!

টানা টানা ডাগর চোখ দুটিতে যেন কিসের স্বপ্ন মাখা। ওর সারা দেহে কি হাড় নেই? এমন লীলায়িত ভঙ্গিতে দেহ লতায় হিল্লোল তুলেচে তবে কি করে? নারীদেহ এমন সুন্দরও হয়!

মেয়েটি আমার দিকে আবার এগিয়ে আসচে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে। কিন্তু ওর মুখে চোখে বেপরোয়া ভাব নেই, ব্রীড়া ও কুণ্ঠায় চোখের পাতা দুটি যেন আমার দিকে এগিয়ে আসার অর্দ্ধ পথেই নিমীলিত হয়ে আসচে। সে কি অবর্ণনীয় ভঙ্গি!

আর গান?

সে গানের তুলনা হয় না। কিন্নরকণ্ঠ বলে একটা কথাই শোনা ছিল, কখনো জানতাম না সে কি জিনিস। আজ ওর গলা শুনে মনে হোল, এই হোল সেই জিনিস। এ যদি কিন্নর-কণ্ঠী না হয়, তবে কার প্রতি ও-বিশেষণ সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হবে?

আবদুল হামিদ এতক্ষণ কি বলেচে আমি শুনতে পাইনি। সে এবার আমার পা ঠেলতেই আমি যেন অনেকটা চমকে উঠলাম। দুপাটি দাঁত বের করে আমার সামনে একটা সিগারেট ধরে সে বলচে—শুনতে পান না যে ডাক্তারবাবু! নিন্—

আমার লজ্জা হোল। কি ভেবে আবদুল হামিদ একথা বলচে কি জানি। ও কি বুঝতে পেরেচে যে আমি ওই মেয়েটিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখচি? বোধ হয় পায়নি। কত লোকই তো দেখচে, আমার কি দোষ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—একবার কলকাতায় গেলে আমার দোকানে পায়ের ধুলো দেবেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেন যাবো না ?

—আমড়াতলা গলির রায় চৌধুরীদের দেখেচেন ?

—না !

—মস্ত বাড়ী আমড়াতলা লেনের মুখেই। টাকায় ছাতা পড়ে যাচ্চে, যাকে বলে বড়লোক—

—সেবার আমাকে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করলে। তা ভাবলাম, অত বড়লোক কি দিয়ে মুখ দেখি ? একটা সোনার কাজল লতা গড়িয়ে নিলাম রাধাবাজার কুণ্ডু কোম্পানীর দোকান থেকে—আর খাওয়ানো কি ! এ সব পাড়াগাঁয়ে শুধু কচুঘেঁচু খেয়ে মরে। দেখে আসুক গিয়ে কলকাতায় বড়লোকের বাড়ি—

—ঠিক তো।

আবদুল হামিদ এতক্ষণ নিজের কথা বলতে পায় নি। এবার সে ফাঁক বুঝে বললে—তা ঠিক, দা মশায় যা বলেচেন। সেবার আমার ইউনিয়নের সাতটা টিউবওয়েল বসাবো। বড়বাবু নিজে থেকে টিউবওয়েলের স্যাকসন করিয়ে দিলেন। গ্যালাম নিজে কলকেতায়। বলি, নিজে নিয়ে এলে দুপয়সা সস্তা হবে। নিজের ইউনিয়নের কাজ নিজের বাড়ির মত দেখতে হবে। নইলে এতে ভোট এবার আমাদের দেবে কেন ? সবাই বলে, চৌধুরী সায়েব আমাদের বাপ-মা। তারপর হোল কি—

রামহরি সরকার বড় অসহিষ্ণুভাবে বললে—ভোটের কথা যদি ওঠালেন, চৌধুরী সাহেব, এবার দু নম্বর ইউনিয়ন থেকে

আমার ভোট যা হয়েচে—ফলেয়ার হারান তরফদার দাঁড়িয়েছিল কি-না? ফলেয়ার যত ভোট সব তার—তা ভাবলাম, এবার আর হোল না বুঝি। কিন্তু গাজিপুর, মঙ্গলগঞ্জ, আর নেউলে বিষ্ণুপুর এই ক'খানা গাঁয়ের একজন লোকও ভোট দিয়েছিল হারান তরফদারকে?

গোবিন্দ দা'র ভাল লাগছিল না। কি পাড়াগাঁয়ের ভোটাভুটির কাণ্ড সে এখানে বসে শুনবে? ছোঃ, কলকাতায় কর্পোরেশনের কোনো ধারণাই নেই এদের। সেবার—

গোবিন্দ দা গল্পটা ফেঁদেছিল সবে, এমন সময় সেই অল্প বয়সী নর্ত্তকীটি ঘুরতে ঘুরতে আবার আমাদের কাছে এল। এবার সত্যিই বুঝলাম, সে আমার মুখের দিকে বার বার চাইচে, চাইচে আর চোখ ফিরিয়ে নিচ্চে। সে এক পরম সুশ্রী ভঙ্গি। অথচ আমি প্যালা দিচ্চি না আর। আবদুল হামিদ এর মধ্যে দুবার টাকা দিয়েচে।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, সেই জন্যেই বা মেয়েটি বার বার আমার কাছে আসচে। আচ্ছা, এবারটা দেখি। এক পয়সা প্যালা দেবো না।

এবার রামহরি সরকার ও গোবিন্দ দাঁ এক সঙ্গে প্যালা দিলে।

আমি জানি এসব পল্লীগ্রামের খেমটা বা ঢপকীর্ত্তনের আসরে, প্যালা দেওয়ার দস্তুর মত প্রতিযোগিতা চলে গ্রাম্য বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে। অমুক এত দিয়েচে, আমিই বা কম কিসে, আমি কেন দেবো না—এই হোল আসল ভাব। কে

কেমন দরের লোক এই থেকেই নির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। আমি সবই জানি, কিন্তু চুপ করে রইলাম। এর কারণ আছে। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই।

এ সময় নেপাল প্রামাণিক এসে হাজির হোল।

বললে—আজ আমার ওখানে একটু চা খাবেন ডাক্তারবাবু।

—তোমার ওখানে সেদিন চা তো খেয়েছি—আজ আমার ডাক্তারখানায় বরং তুমি আর আবদুল হামিদ চা খেও।

গোবিন্দ দা বললে—আমি বুঝি বাদ যাবো?

—বাদ যাবে কেন? চলো আমার সঙ্গে।

—তা হোলে আমার বাড়িতে আপনি রাতে পায়ের ধুলো দেবেন বলুন।

—এখন সে কথা বলতে পারিনে। কত রাতে আসর ভাঙ্গবে, কে জানে?

—সমস্ত রাত দেখবেন?

—দেখি। ঠিক বলতে পারিনে।

আবার মেয়েটি ঘুরে ঘুরে আমার সামনে এসেচে। কি জানি ওর মুখে কি আছে, আমি যতবার দেখচি, প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু, অপূর্ব্ব কিছু দেখেচি জীবনে, কিন্তু অমন মুখ অমন চোখ আমি কারো দেখেচি বলে মনে তো হয় না।

আমি এবারেও প্যালা দিলাম না।

কিন্তু একবার ওর মুখের দিকে চাইতেই দেখি ও আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে।

আমার অত্যন্ত আনন্দ হোল হঠাৎ! অকারণ আনন্দ!

ওই অপরিচিতা বালিকাটি আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, এতে আমার আনন্দের কারণ কি? কে বলবে।

সেই আনন্দে অদ্ভুত মুহূর্ত্তে আমার মনে হোল, আমি সব যেন বিলিয়ে দিতে পারি, যা-কিছু আমার নিজস্ব আছে। সব কিছু দিয়ে দিতে পারি। সব কিছু। তুচ্ছ পয়সা, তুচ্ছ টাকা-কড়ি।

সেই মুহূর্ত্তে দুটাকা প্যালা হাত বাড়িয়ে দিতে গেলাম, মেয়েটি সাবলীল ভঙ্গীতে আমার সামনে এসে আমার হাত থেকে টাকা দুটি উঠিয়ে নিলে। আমার হাতের আঙুলে ওর আঙুল ঠেকে গেল। আমার মনে হোল ও ইচ্ছে করে আঙুলে আঙুল ঠেকালে। অনায়াসে টাকা দুট তুলে নিতে পারতো সন্তর্পণে।

চোখ বুজে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলাম।

হঠাৎ এই খেমটার আসর আমার কাছে অসাধারণ হয়ে উঠলো! আমার সাধারণ অস্তিত্ব যেন লোপ পেয়ে গেল। আমি যুগযুগান্ত ধরে খেমটা নাচ দেখচি এখানে বসে। আমি অমর, বিজয় বিশ্বে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। যুগযুগান্ত ধরে ওই মেয়েটি আমার সামনে এসে অমনি নাচচে।

ওর অঙ্গুলির স্পর্শে আমার অতি সাধারণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন জীবন ভূমার আনন্দ আস্বাদ করলে। অতি সাধারণ আমি অতি অসাধারণ হয়ে উঠলাম। আরও কি কি হোল, সেসব বুঝিয়ে বলবার সাধ্যি নেই আমার। আমি গ্রাম্য ডাক্তার মানুষ, এ গ্রামে ও গ্রামে রুগী দেখে বেড়াই, সনাতনদা'র সঙ্গে

গ্রাম্যদলাদলির গল্প করি, একে ওকে সা...ন শাসন করি, আর এই প্রহ্লাদ সাধুখাঁ, নেপাল প্রামাণিক, ভূষণ দাঁয়ের মত লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে বেড়াই। আমি হঠাৎ এ কি পেয়ে গেলাম? কোন্ অমৃতের সন্ধান পেলাম আজ এই খেমটা নাচের আসরে এসে? আমার মাথা সত্যিই ঘুরচে। উগ্র মদের নেশার মত নেশা লেগেচে যেন হঠাৎ। কি সে নেশার ঘোর, জীবন ভোর এর মধ্যে ডুবে থাকলেও কখনো অনুশোচনা আসবে না আমার।

নেপাল প্রামাণিক বললে—তাহোলে আমি বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে আসি? ক'পেয়ালা চা হবে?

আমি সবিস্ময়ে বললাম—কিসের চা?

—এই যে বললেন আপনার ডাক্তারখানায় চা হবে।

—ও! দুধ?

—হ্যাঁ, দুধ না হোলে চা হবে কিসে!

আবদুল হামিদ মন্তব্য করলে—ডা...রবাবুর এখন উঠবার ইচ্ছে নেই।

আমার বড় লজ্জা হোল। ও বোধ হয় বুঝতে পেরেচে আমার মনের অবস্থা। ও কি কিছু লক্ষ্য করেচে?

আমি বললাম—চলো চলো, চা খেয়ে আসা যাক। ততক্ষণ নেপাল দুধ নিয়ে আসুক।

আধঘণ্টা পরে আমার ডাক্তারখানায় বসে সবাই চা খাচ্চি, গোবিন্দ দাঁ বলে উঠলো—ছোট ছুঁড়িটা বেশ দেখতে কিন্তু। না?

আবদুল হামিদ ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে অমনি বললে —আমিও তাই বলতে যাচ্ছি—বড্ড চমৎকার দেখতে। ডাক্তারবাবু কি বলেন ?

—কে ? হ্যাঁ—মন্দ নয়।

গোবিন্দ দাঁ বললে—মন্দ নয় কেন ? বেশ ভালো।

আমি বললাম—তা হবে।

আবদুল হামিদ বললে—ছুঁড়িটার বয়স কত হবে আন্দাজ ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—তা বেশি নয়। অল্প বয়েস।

—কত ?

—পনেরো কিংবা ষোল। দেখলেই বোঝা যায় তো—

আবদুল হামিদ সশব্দে হেসে বলে উঠলো—হ্যাঁ, ওসব যথেষ্টই ঘেঁটেচেন আমাদের দাঁ মশায়। ওঁর কাছে আর আমাদের—

ওদের কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগছিল না। ওদের এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই বললাম—চলো চা খাইগে। রাত হয়ে যাচ্চে। আমি এখান থেকে অনেক দূর চলে যেতে চাই ওদের সঙ্গ ছেড়ে। ওরা যে মেয়েটির দিকে বার বার চাইবে, এও আমার অসহ্য—সুতরাং ওদেরও সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

নেপাল প্রামাণিক দুধ নিয়ে এল। আমি সকলেক চা পরিবেশন করলাম।

আবদুল হামিদ বললে—একদিন এখানে ফিস্টি করুন ডাক্তারবাবু, আমি একটা খাসি দেবো।

গোবিন্দ দাঁ পিছপাও হবার লোক নয়, সে বললে—আমি কলকাতা থেকে ভাহুয়া ঘি আনিয়ে দেবো। হুজুরিমল রূপ-ছোড়লাল মস্ত বড় ঘিয়ের আড়তদার পোস্তার ধাঁটি পশ্চিমে ভাহুয়া। আমার সঙ্গে যথেষ্ট খাতির। আমাদের দোকান থেকে রং নেয় ওরা। সেবার হোল কি—

রামহরি সরকার ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললে—কিসের পশ্চিমের ঘি ? আমার ইউনিয়নে যা গাওয়া ঘি মেলে, তার কাছে ওসব কি বললে ভাহুয়া মাহুয়া লাগে না। দেড় টাকা সের গাওয়া ঘি কত চাই ? এখনি হুকুম করলে দশ সের ঘি নিয়ে এসে ফেলবে। করুন না ফিস্তি।

এরা যে আবার আসরে গিয়ে বসে এ যেন আমি চাইনে। ছুতো নাতায় দেরি হয়ে যাক এ আমারও ইচ্ছে। সুতরাং আমি এদের ওই স্থূল ধরনের কথাবার্ত্তায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলাম। আরও পাঁচরকম ঘি-এর কথা হোল, কি কি খাওয়া হবে তার ফর্দ্দ হোল, কবে হতে পারে তার দিন স্থির করতে কিছু সময় কাটলো। ওরা আসরে গিয়ে মেয়েটিকে না দেখুক।

নেপাল প্রামাণিক এই সময় আমায় হাতজোড় করে বললে—একটা অনুরোধ আছে, আমার বাড়িতে লুচি ভেজেচে। বড়বৌ যত্ন করে ভাজচে আপনার জন্যে। একটু পায়ের ধুলো দিতে হবেই।

আমার নিজেরও ইচ্ছে আর আসরে যাবো না। ওর ওখানে খেতে গেলে যে সময় যাবে, তার মধ্যে খেমটার আসর

ভেঙে যাবে। বললাম—বেশ, তাতে আর কি হয়েচে? চলো যাই।

নেপাল প্রামাণিকের বড় চৌচালা ঘরের দাওয়ায় আমার জন্যে খাবার জায়গা করা হয়েচে, নেপাল প্রামাণিকের বড় বৌ থালায় গরম লুচি এনে পরিবেশন করলে। বড় ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণের ওপর অমন ভক্তি আজকার কালে বড় একটা দেখা যায় না। আমার সঙ্গে কথা বলে না, তবে আকারে ইঙ্গিতে বুঝতে পারি ও কি বলতে চাইচে। যেমন একবার লুচির থালা নিয়ে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আমি বললাম—না মা, আর লুচি দিতে হবে না।

নেপালকে আমার অদূরে খাবার জায়গা করে দেওয়া হয়েচে। সে বললে—নিন নিন ডাক্তারবাবু, ও অনেক কষ্ট করে আপনার জন্যে লুচি ভেজেচে। সন্দে থেকে আমাকে বলচে ডাক্তারবাবুকে অবিশ্যি করে খেতে বলবা।

বড়বৌয়ের ঘোমটার মধ্যে থেকে মৃদু হাসির শব্দ পাওয়া গেল।

খান আষ্টেক গরম লুচি চুড়ির ঠুনঠান শব্দের সঙ্গে পাতে পড়লো।

—উঁ হুঁ হুঁ—এত কেন? কি সর্ব্বনাশ!

বড় বৌ ফিস্ ফিস্ করে অদূরে ভোজনরত নেপালের কানের কাছে মুখ নামিয়ে কি বললে, নেপাল আমায় বললে—বড়বৌ বলচে ডাক্তারবাবুর ছোকরা বয়েস, কেন খাবেন না এ ক'খানা লুচি—এই তো খাবার বয়েস।

আমি বললাম—আমার বয়েস সম্বন্ধে মায়ের একটু ভুল হচ্চে। ছোকরা বড় নই, পঁয়ত্রিশের কোঠায় পা দেবো আশ্বিন মাসে।

আবার ফিস্ ফিস্ শব্দ। নেপাল তার অনুবাদ করে বললে—বড় বৌ হাসচে, বলচে, ওর ছোট ভাইয়ের চেয়েও কম বয়েস।

আমি জানতাম নেপালের দুই সংসার। কিন্তু ওর বড়-বৌটি সত্যই সুন্দরী, এর আগেও দু বার দেখেচি বৌটিকে। বয়েস চল্লিশের ওপরে হোলেও নিঃসন্তানা বলেই হোক বা যে কারণেই হোক, এখনও বেশ আঁটসাট গড়ন, দিব্যি স্বাস্থ্যবতী, গায়ের রং পঁচিশ বছরের যুবতীর মত। বেশ শান্ত

আমি উত্তর দিলাম—মাকে বলো আর দু খানা পটল ভাজা দিতে—

বৌটি পটলভাজা পাতে দিলে এনে।

আমি মুখ তুলে তাকেই উদ্দেশ করে বললাম—আচ্ছা, এ রকম কেন, মা, কর বলো তো? চমৎকার রান্না কিন্তু নুন দাও না কেন? সেবারও তাই, এবারও তাই। সেবার বলে গেলাম তোমায়, তুমি নুন দিও তরকারিতে, ওতে আমার জাত যাবে না। তবুও নুন দাওনি এবার।

বড়বৌ এবার খুব জোরে ফিস্ ফিস্ করলে এবং খানিকক্ষণ সময় নিয়ে।

নেপাল হেসে বললে—বড়বৌ বলচে ব্রাহ্মণের পাতে নুন দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবো সে ভাগ্যি করিনি। এ জন্মে আর

তা হয়ে উঠবে না। নরকে পচে মরবো শেষে? ছোট জাত আমরা—

—ও সব বাজে কথা।

—না ডাক্তারবাবু, আপনাদের মত অন্যরকম। আপনারা ইংরেজী পড়ে এ সব মানেন না, কিন্তু ভগবানের কাছে দোষী হতে হবে তো?

—ইংরেজী পড়ে নয় নেপাল, মানুষের সঙ্গে মানুষের তফাৎ সৃষ্টি করেচে সমাজ, ভগবানকে টেনো না এর মধ্যে।

—ভগবান নিজেই ব্রাহ্মণের পায়ের চিহ্ন বুকে ধরে আছেন। আছেন কি না আছেন বলুন?

—আমি দেখিনি ভগবানকে, তাঁর বুকে কি আছে না আছে বলতে পারবো না। কিন্তু নেপাল, এটুকু তুমিও জানো আমিও জানি, তাঁর দেওয়া ছাপ কপালে নিয়ে কেউ পৃথিবীতে আসে নি।

—তবে বাবু, কেউ ব্রাহ্মণ কেউ শূদ্দুর হয় কেন?

—আমি জানিনে, তুমিই বলো।

—কর্ম্মফল। আপনার সুকৃতি ছেল আপনি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেচেন, আমার পুণ্যি ছেল না, আমি শূদ্দুর হয়ে—

এ তর্কের মীমাংসা নেই, বিশেষত এদের বুঝানো আমার সম্ভব নয়, সুতরাং চুপ করে খাওয়া শেষ করলাম।

রাত বেশি হয়েচে। নেপাল বললে—আপনি শোবেন এখানে তো? বড়বৌ বলচে।

—না, আমি ডিসপেন্সারিতে শোবো। রাত বেশি নেই। ভোর রাত্রে নৌকো ছাড়বো।

—কষ্ট করে কেন শোবেন। বড়বৌ আপনার জন্তি পূবির ঘরে তক্তাপোশে বিছেন পেতে রেখেচে।

তখন যদি নেপাল প্রামাণিকের কথা শুনতাম, তার ভক্তিমতী সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর কথা শুনতাম! তারপরে কতবার এ কথা আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

আমি নেপালের বাড়ী থেকে চলে এলাম ডাক্তারখানায় নেপাল লণ্ঠন ধরে এগিয়ে দিয়ে গেল। ডাক্তারখানার ওদিকের বারান্দায় নৌকোর মাঝিটা অঘোরে ঘুমুচ্চে। আমি ঘরে ঢুকে নেপালকে বিদায় দিয়ে বিছানা পাতবার যোগাড় করচি, এমন সময় বাইরে গোবিন্দ দাঁ আর আবদুল হামিদের গলা পেলাম।

আবদুল হামিদ বললে—ও ডাক্তারবাবু, আলো জ্বালুন—ঘুমুলেন নাকি?

বললাম—কি ব্যাপার?

নিশ্চয়ই এরা চা খেতে এসেচে। কিন্তু এত রাত্রে আমি দুধ পাই কোথায় যে ওদের জন্তে চা করি আবার? বিপন্নমুখে দোর খুলে ওদের পাশের ঘরে বসিয়ে শোয়ার ঘর থেকে লণ্ঠন নিয়ে ডিসপেন্সারির ঘরে ঢুকেই আমি দেখলাম একটি মেয়ে ওদের সঙ্গে। স্বাভবতই আমার মনে হোল

কারো অসুখ করেচে ; নইলে এত রাত্রে ওরা দুজনে ডিসপেন্-সারিতে আসবে কেন ?

ব্যস্ত সুরে বললাম—কী হয়েচে বলো তো ? কে মেয়েটি ?

গোবিন্দ দা বললে—বসুন, ডাক্তারবাবু, বসুন—কথা আছে।

—কে বলো তো, ও মেয়েটি ?

আবদুল হামিদ দাঁত বের করে হেসে বললে—আপনার রুগী। দেখুন তো—

সেই কিশোরী নর্ত্তকীটি। আমার মাথা যেন ঝিম ঝিম করে উঠলো। মেয়েটির সলজ্জ দৃষ্টি মাটির দিকে নামানো। মনে হোল, ওর কপাল ঘেমে উঠচে ক্লান্তিতে ও সপ্রতিভ কুণ্ঠায়।

আমি এগিয়ে এসে বলি—কি, কি ব্যাপার ? হয়েচি কি ?

গোবিন্দ দা হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে উঠলো—আবদুল হামিদের হাসির সুরটা খিক্ খিক্ শব্দে নদীর ধারে পুরোনো শিমুল গাছে শিকৃরে পাখীর আওয়াজের মত।

বিরক্ত হয়ে বললাম—আঃ, বলি কি হয়েচে শুনি না ?

গোবিন্দ দা বললে—মাথা ধরেচে, মাথা ধরেচে—নেচে গেয়ে মাথা ধরেচে, এখন ওষুধ দিন, রোগ সারান।

টেবিলের ওপর থেকে স্মেলিং সল্টের শিশিটা তুলে বললাম—এটা জোরে শুঁকতে বলো, এখুনি সেরে যাবে।

আবদুল হামিদ আর একবার শিকৃরে পাখীর আওয়াজের

মত হেসে উঠলো। গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনি চিকিচ্ছে করুন। আমরা চলি।

—কেন, কেন ?

আমাদের আর এখানে থাকার কি দরকার ?

সত্যই ওরা উঠে চলে যেতে উদ্যত হোল দেখে আমি বললাম—বোসো বোসো। কি হচ্চে ? ওষুধ শিশিতে দিচ্চি—

গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনি ওষুধ দেবেন, দিন। দিয়ে ওকে পটল কলুর আটচালা ঘরে ওদের বাসা, সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা চলি।

আবদুল হামিদ বললে—ওষুধের দামটা আমার কাছ থেকে নেবেন।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন, আমি দেবো।

ওদের ইতর ব্যবহারে আমার বড় রাগ হোল। আমি ধমক দেওয়ার সুরে বললাম—কি হচ্চে সব ? ওষুধ যদি দিতে হয় তার দামটা আমি না নিতেও তো পারি। বসো সব। কেউ যেও না। কি হয়েচে শুনি ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—মাথা ধরেচে বললাম তো। ওগো, বল না গো, তোমার কি হয়েচে, তোমার চাঁদ মুখ দিয়ে কথা না বেরুলে আমাদের ডাক্তারবাবু বিশ্বাস করচেন না যে। বললে মাথা ধরেচে—নিয়ে এলাম ডাক্তারের কাছে। এখন রুগী-ডাক্তারে কথাবার্ত্তা হোক, আমরা তো বাড়তি মাল—হাবাক্

জিঙ্কের পিপের সোল এজেন্ট—এখানে আর আমরা কেন?
ওঠো আবদুল হামিদ—

সত্যিই ওরা চলে গেল। আমি মেয়েটির মুখের দিকে চাইলাম। দুটি চোখের সলজ্জ চাউনি আমার মুখের দিকে স্থাপিত। এভাবে আমি একা কোন মেয়ের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্থ নই, আমি যেন ঘেমে উঠলাম। তার উপরে অন্য কোনো মেয়ে নয়, যে মেয়েটি কাল থেকে আমার একঘেয়ে জীবনে সম্পূর্ণ নতুনের স্বাদ এনে দিয়েচে, সেই মেয়েটি। হঠাৎ আমি নিজেকে দৃঢ় করে নিলাম। আমি না ডাক্তার? আমার গলা কাঁপবে একটি বালিকার সঙ্গে চিকিৎসক হিসেবে কথাবার্ত্তা বলতে?

বললাম—কি হয়েচে তোমার?

মেয়েটি আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—আপনি ডাক্তারবাবু?

অদ্ভুত প্রশ্ন। এতটুকু মেয়ের মুখে। গম্ভীর মুখে বলবার চেষ্টা করলাম—তবে এখানে কি জন্য এসেচ? দেখতেই তো পাচ্চ।

আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য। মেয়েটি ফিক্ করে হেসে ফেলেন পরক্ষণেই লজ্জায় মুখখানি নীচু করে আঁচল চাপা দিলে—আঁচল-চাপা মুখ আমার দিকে তুলে আবার ফিক্ করে হেসে উঠলো। সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি, সে ভঙ্গির অপূর্ব্ব লাবণ্য আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই। আমার বুদ্ধি যেন লোপ পাবার উপক্রম হোল—এমন ধরনের মেয়ে আমি

কখনও দেখিনি। মেয়ে দেখেচি সুরবালাকে—শান্ত, সংযত-ভদ্র, বড় জোর, দেখেচি শান্তিকে। না হয় নির্জ্জন রাস্তায় অবসর খুঁজে কথা বলে, তাও দরকারী কথা, নিজের গরজে। এমন সাবলীল ভঙ্গি তাদের সাধ্যের বাইরে। তাদের দেহে হয় না, জন্মায় না। ছেলেমানুষ নারী বটে, কিন্তু সত্যিকার নারী।

বললাম—হাসচো কেন? কি হয়েচে?

—মাথা ধরেচে। অসুখ হয়েচে।

—মিথ্যে কথা।

—উঁহু-হুঁ! ভারী ডাক্তার আপনি!

যেন কত কালের পরিচয়। কোনো সঙ্কোচের বালাই নেই।

ওর সামনের চেয়ারে বসে ওর হাত ধরলাম। ও হাত টেনে নিলে না। নির্জ্জন ঘরে ও আর আমি। রাত একটা কিংবা দুটো। কে জানে কেই বা খবর রাখে। আমার মনে হোল জগতে ঐ মেয়েটি আমার সামনে বসে আছে যুগ যুগ ধরে। সারা বিশ্বে দুটি মাত্র প্রাণী—ও আর আমি।

আমি বললাম—তোমার নাম কি?

—কি দরকার আপনার সে খোঁজে?

—তবে এখানে এসেচ কেন?

—ওষুধ দিন। হাতটা ধরেই রইলেন যে, দেখুন না হাত।

—কিছুই হয়নি তোমার।

—না, সত্যি আমার মাথা ধরেছিল।

—এখন আর নেই।

—কি করে বুঝলেন।

—তুমি একটি দুষ্টু বালিকা। কত বয়েস তোমার? পনেরো না ষোল্লো?

—জানিনে।

আমি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—তবে আমিও জানিনে ডাক্তারি করতে। তুমি যাও এখান থেকে, এখুনি যাও।

ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। আমার গলার স্বর বোধ হয় একটু কড়া হয়ে পড়েছিল। ভীরু চোখে আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—রাগ করলেন? না, না, রাগ করবেন না। আমার বয়েস ষোলো।

—নাম কি?

—পান্না। ভালো নাম, সুধীরাবালা—

—যার সঙ্গে এসেচ ও তোমার কে হয়?

—কেউ নয়। ওর সঙ্গে মুজরো করে বেড়াই, মাইনে দেয়, প্যালার অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হয়।

—কোথায় থাক তোমরা?

—দমদমা সিঁথি। বাড়ীওয়ালীর বাগান বাড়ীতে।

—সে আবার কে?

—বাড়ীউলী মাসির টাকায় তো খেমটার দল চলে। থাকতে দেয়, খেতে দেয়। সে-ই তো সব।

—ওষুধ দেবো? মিথ্যে কথা বলে এসেছ কেন এখানে? ওই তোমার সঙ্গের মেয়েটা এখানে তোমায় পাঠিয়েচে?

-না।

—সত্যি বলো। মিথ্যে ভান করেচো কেন অসুখের ? ও পাঠিয়েচে—না ? তোমায় শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েচে।

মেয়েটি লজ্জায় কেমন যেন ভেঙে পড়ে বললে—তা না।

বলেই মুখ নীচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হোলো ও সত্যি কথা বলচে। ওর সঙ্গিনী পাঠায় নি, ছল করে ও নিজেই এসেচে। স্বেচ্ছায় এসেচে। অসুখ বিসুখও নয়—কোনো অসুখ নেই ওর।

হঠাৎ মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে কেমন এক রকম অদ্ভুত সুরে বললে—আমি চললাম, আপনি বড় খারাপ লোক।

বিস্ময়ের সুরে বললাম—খারাপ ?—কেন, কি করলাম তোমার ?

—আমি বলিনি তো কিছু। আমি যাই, আসর কোন্ দিকে ? বাপরে, কত রাত হয়ে গিয়েচে ! আমায় একটু এগিয়ে দিন না।

—তা পারবো না। আসরে অনেক লোক, তোমার সঙ্গে আমায় দেখতে পেলে কে কি বলবে। আমি পথ দেখিয়ে দিচ্চি—তুমি যাও। কোনো ভয় নেই, বাজারের মধ্যে চারিদিকে লোক, ভয় কিসের।

মেয়েটি চলে যেতে উদ্যত হোলে আমার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলো। আমি খপ্ করে ওর হাত ধরে ওকে সেই কেদারখানাতে আবার বসিয়ে দিয়ে বললাম—কেন এসেছিলে,

না বলে যাবার জো নেই পান্না,—না, এই নামই তো ? রাগ করলে নাকি ডাকনাম ধরে ডাকলাম বলে ?

মেয়েটি হেসে বললে—ডাকুন না যত পারেন।

—তুমি এখানে এসে বসে আছ, তোমার সঙ্গের সে মেয়েটা কি ভাববে ?

—ভাবুক সে। আমার তাতে কি ?

—তুমি তো দেখচি খুব ছেলেমানুষ—তোমার কথার সুরেই তার প্রমাণ।

পান্না চোখের ভুরু ওপর দিকে দুবার তুলে আবার নামিয়ে চোখ নাচিয়ে কৌতুকের সুরে বললে—হুঁ-উ-উ ?

শেষের দিকের জিজ্ঞাসার সুরটা নিরর্থক। কি সুন্দর হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে।

আমার হঠাৎ মনে হোল ওকে আমি বুকে টেনে নিয়ে ওর ফুলের মতো লাবণ্যভরা দেহটা পিষে দিই বলিষ্ঠ বাহুর চাপে। মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করে উঠলো। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। এ অবস্থা ভাল নয়। ও এখান থেকে চলে যাক্। ছি :—

—পান্না, তুমি চলো, এগিয়ে দিয়ে আসি।

—আপনি বড় মজার লোক কিন্তু—আমি কেন এসেছিলাম জিজ্ঞেস করলেন না যে ?

—তুমি বললে না তো আবার জিগ্যেস করে কি হবে ? তুমি [illegible]বনের দুষ্টু—পান্না।

—'পান্না' কেন, আমার ভাল নামে ডাকুন না? সু-ধী-রা বালা—

—ওর চেয়ে পান্না ভালো লাগে—সত্যি বলচি।

—আমিও সত্যি বলচি আপনাকে আজ রাত্রে—

এই পর্য্যন্ত বলেই কি একটা বলবার মুখে হঠাৎ থেমে গিয়ে ও সলজ্জ হেসে মুখ নিচু করে থেকে চুপি চুপি কি কতকগুলো কথা আপনা আপনি বলে গেল।

—কি বললে?

—বলচি এই গিয়ে—আপনাকে আজ রাত্তিরে-এ-এ—

—আঃ, লজ্জায় তো ভেঙে পড়লে। বলো না কি?

—আমার লজ্জা করে না বুঝি! আমি যাই—এগিয়ে দিন।

আমি উঠলাম। আমার সম্বিৎ ফিরে এসেচে। আমি চিকিৎসক, আমারই ডাক্তারখানায় সমাগত একটি রোগিণীর সঙ্গে রাতদুপুরে এমন বিশ্রম্ভালাপ শোভা পায় না আমার। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়েচে! বিবাহিত ভদ্রলোক।

বললাম—চলো না, ওঠো। এগিয়ে দিয়ে আসি—

হরি ময়রার দোকান পর্য্যন্ত এসে দেখি আসরের দিকে তখনও মেলা লোকের ভিড়। কেউ পান বিড়ি খাচ্চে, কেউ জটলা করে গল্প করচে। স্থানীয় বাজারের লোকে এখনও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্চে, পানবিড়ির দোকান এখনও খোলা।

পান্না নিজেই আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ কুণ্ঠায় ভদ্রঘরের বধূটির মত বললে—আপনি যান, লোকের ভিড় রয়েচে। আপনাকে দেখতে পাবে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি, ও চলে যাচ্চে—যেতে যেতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—আজ আমাদের শেষ দিন—জানেন তো ?

—জানি।

—আপনি আসবেন ?

—তা বলতে পারিনে—আজ এত রাত পর্য্যন্ত জেগে। কাল বাড়ীর ডাক্তারখানায় রুগী দেখতে হবে—

—সন্দের পর কাল আরম্ভ হবে তো ? আপনি আসবেন, কেমন তো ? তার পরেই মাথা দুলিয়ে বললে—ঠিক, ঠিক, ঠিক। যাই—

আমি কিছু বলবার আগেই পান্না হরি ময়রার দোকানের ছেঁচতলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফিরে চলে এলাম ডাক্তারখানাতে। মাথার মধ্যে কেমন করচে। পান্নার সঙ্গে জীবনের যেন অনেকখানি চলে গেল। জীবনকে এতদিন কিছুই জানিনি, দেখিনি। শুধু ঘুরে মরেছি পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারি করে আর সনাতনদার মত গেঁয়ো লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে। আজ যেন মনে হোল, এ জীবন একেবারে ফাঁকা, এতে আসল জিনিস কিছুই নেই। নিজেকে ঠকিয়েছি এতদিন।

মাঝি বললে—বাবু, বাড়ি যাবেন তো ? নৌকো ছাড়ি ?

—একটা শক্ত কেস্ আছে, যাবো কি না তাই ভাবচি।

চলুন বাবু, কাল খাওয়া দাওয়া করে চলে আসবেন।

কাঠের পুতুলের মত গিয়ে নৌকোতে উঠলাম। নৌকো ছাড়লো, আমি শুয়ে রইলাম চোখ বুজে কিন্তু পান্নার মুখ

কেবলই মনে পড়ে, তার সেই অদ্ভুত হাসি, সকুণ্ঠ চাউনি। লাবণ্যময়ী কথাটা বইয়ে পড়ে এসেছি এতদিন, ওকে দেখে এতদিন পরে বুঝলাম নারীর লাবণ্য কাকে বলে। কি যেন একটা ফেলে যাচ্ছি মঙ্গলগঞ্জের বারোয়ারি তলায়, যা ফেলে আমি কোথাও গিয়ে শান্তি পাবো না।

মনে মনে একটা অদ্ভুত কল্পনা জাগলো।

নিজেই অবাক হয়ে গেলাম এ ধরনের কল্পনার সম্ভাব্যতায় —আমার মনে এ ধরনের কল্পনার সম্ভাব্যতায়। ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছি, সংসার ছেড়ে দিয়েছি, পান্না যদি আমাকে চায় তবে ওকে নিয়ে চলে গিয়েছি সুদূর পশ্চিমে কোনো এক অজ্ঞাত ছোট শহরে। পান্নার সীমন্তে সিন্দুর, মুখে সেই হাসি ··· ··· আমার সঙ্গে এক নির্জ্জন ছাদে ··· ··· দুজনে মুখোমুখি ··· ··· কেউ কোথাও নেই ··· ··· কেউ আমাকে ডাক্তারবাবু বলে খাতির করবার নেই। এখানে আমার বংশগৌরব আমার সব স্বাধীনতা হরণ করেচে। ··· ···

কিসের বংশগৌরব, কিসের যশমান ?

ওকে যদি পাই ?

হয়তো তা আকাশ-কুসুম। ও সব আলেয়ার আলো, হাতের মুঠোয় ধরা দেয় না কোনো দিন। পান্না আমার হবে, এ কথা ভাবতেই আমার সারা দেহমনে যেন বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। পান্না খাঁটি নারী, আমি এতদিন নারী দেখিনি। ওদের চিনতাম না। আজ বুঝলাম ওকে দেখে।

পান্না আজ আমার ডাক্তারখানায় কেন এসেছিল ? ওষুধ

নিতে নয়। না, ওষুধ নিতে? কিছুই বুঝলাম না ওর কাণ্ড। অসুখ কিছু ছিল না, মাথা ধরতে পারে হয়তো। কিন্তু যদি এমন হয়, ও ওষুধ নেবার ছল করে এসেছিল অভিসারে আমার কাছে? কিন্তু আবদুল হামিদ আর গোবিন্দ দাঁর সঙ্গে কেন?

নাঃ, কিছুই পরিষ্কার হোল না।

আচ্ছা, যদি সত্যিই ও অভিসারে এসেছিল এমন হয়?

কথাটা ভাবতে আমার দেহমনে আবার যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। তাও কি সম্ভব? আমার বয়েস পঁয়ত্রিশ, পান্না ষোল বছরের কিশোরী। অসম্ভব কি খুব? তবে এমন অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে এর চেয়েও বেশি বয়েসে কিশোরীর প্রেম লাভ করেছিল, সে সব ···

আমার মত গেঁয়ো ডাক্তারের অদৃষ্টে কি ওসব সম্ভব হবে? যা নাটক নভেলে পড়েছি, তা হবে আমার জীবনে মঙ্গলগঞ্জের মত অজ পাড়াগাঁয়ে?

মাথার মধ্যে কেমন নেশা ··· ··· উঠে নদীর জল চোখে মুখে দিলাম। আমার শরীরের অবস্থা যেন মাতালের মত। মাঝি বললে—ডাক্তারবাবু, ঘুমোন নি?

বললাম—না বাপু, মাথা গরম হয়ে গিয়েচে না ঘুমিয়ে।

—চলুন বাবু, বাড়ি গিয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুম দেবেন এখন।

আমি তখন ভাবছি, এসে ভুল করেছি। না এলেই হোত। যদি এমন কিছু ঘটে বাড়ি গিয়ে, কাল সন্দেবেলা মঙ্গলগঞ্জে আসা না ঘটে? পান্নার সঙ্গে আর দেখা হবে না, ও চলে যাবে

কলকাতায়। তা হবে না, অমন ভাবে পান্নাকে আমি হারাতে রাজী নয়।

বাড়ি এসে স্নান করে একটু মিছরির সরবৎ খেয়ে বৈঠক-খানায় গিয়ে বসেছি, এমন সময় বড় মুখুজ্যের ছেলে হারান এসে বললে—শশাঙ্কদা, একবার আমাদের বাড়ি যেতে হচ্ছে—

—কেন হে এত সকালে?

—জামাই এসেচেন, একটু চা খাবে তাঁর সঙ্গে সকালে।

—মাপ করো ভাই, কাল সারারাত ঘুমুই নি। মঙ্গলগঞ্জে শক্ত কেস্ ছিল—

—ভালো কথা, হ্যাঁহে মঙ্গলগঞ্জে নাকি বারোয়ারিতে ভাল খেমটা নাচ হচ্চে, কে যেন বলছিল—

আমার বুকের ভেতরটা যেন ধড়াস করে উঠলো। জিব শুকিয়ে গেল হঠাৎ। এর কারণ আর কিছু নয়, মঙ্গলগঞ্জের কথা উঠতেই পান্নার মুখ মনে প'ড়লো ... ... ওর হাসি ... সেই অপূর্ব্ব লীলায়িত ভঙ্গি মনে পড়ে গেল ...

আমি সামলে নিয়ে বললাম—বারোয়ারি?—হাঁ, হচ্চে শুনেছি ......

হঠাৎ আমার মনে হোল খেমটা নাচ হচ্চে শুনে হারান যদি আজ আমার নৌকোতেই (কারণ আমি আজ যাবোই ঠিক করে ফেলেছি) মঙ্গলগঞ্জ যেতে চায় তবে সব মাটি। পান্নার সঙ্গে দেখা করার কোনো সুবিধে হবে না ও আপনের সামনে, এমন কি হয়তো, নাচের আসরেই যেতে পারবো না।

স্নুতরাং ওপরের উক্তিটি শুধরে নেবার জন্য বললাম—কিন্তু সে কাল বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েচে।

—শেষ হয়ে গিয়েছে ?

উদাসীন স্নুরে বলি—তাই শুনছিলাম। আমার তো ওদিকে যাওয়া টাওয়া নেই—লোকে বলছিল—

হারান বললে—হ্যাঁ, তুমি আবার যাবে খেমটার আসরে নাচ দেখতে! তোমাকে আমি আর জানিনে! তা ছাড়া, তোমার সময়ই বা কোথায়? তাহোলে চলো একটু চা খেয়ে আসবে।

—না ভাই, আমায় মাপ করো। হাতে অনেক কাজ আজকে—

একটু পরে সনাতনদা এসে বললে—কাল নাকি সারা রাত কাটিয়েচ মঙ্গলগঞ্জে? কি কেস্ ছিল?

বিরক্তির সঙ্গে বললাম—ও ছিল একটা।

—আজ যাবে নাকি আবার?

—এত খবর তোমায় দিলে কে? কেন বলো তো? গেলে কি হবে?

সনাতনদা একটু বিস্মিত ভাবে আমার দিকে চাইলে, এই সামান্য প্রশ্নে আমার বিরক্তির কারণ কি ঘটতে পারে, বোধ হয় ভাবলে। বললে—না, না—তাই বলছিলাম—

—হ্যাঁ, যেতে হবে। কেন বলো তো?

যা ভয় করেছিলাম, সনাতনদা বলে বসলো—আমাকে নিয়ে যাবে তোমার নৌকোতে? নাকি, ভাল বারোয়ারি গান হচ্ছে মঙ্গলগঞ্জে। একটু দেখে আসতাম—

আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। বললাম—কে বললে ভালো? রামো, বাজে খেমটা নাচে, কলিকাতার খেমটাউলীদের—

সনাতনদা জানে, আমি নীতিবাগীশ লোক, সুতরাং আমার সামনে সে বলতে পারলে না যে খেমটা নাচ দেখতে যাবে। আমিও তা জানতাম। খেমটা নাচের কথা শুনে সনাতনদা তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—খেমটা? ঝাঁটা মারো! ও আবার ভদ্রোলোকে দেখে! তুমি গিয়েছিলে নাকি? .... নাঃ, তুমি আবার যাচ্চ ওই দেখতে!

—গিয়েছিলাম একটুখানি।

সনাতন সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—তুমি!

হেসে বললাম—হ্যাঁ গো আমি।

সনাতন ভেবে বললে—তা তোমাকে খাতিরে পড়ে যেতে হয়। পাঁচজনে বলে, তুমি হোলে ডাক্তারমানুষ—

সনাতনদা আর ও সম্বন্ধে কিছু বললে না। অন্য কথাবার্ত্তা খানিকক্ষণ বলে উঠে চলে গেল। আমি বাড়ির ভেতর গিয়ে স্নানাহার করে নিয়ে ওপরে শোয়ার ঘরে যেতেই সুরবালা এসে ঘরের জানালা বন্ধ করে দিয়ে গেল। চোখে আলো লাগলে দিনমানে আমার ঘুম হয় না সে জানে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি নে, উঠলাম যখন তখন বেলা বেশি নেই। তখুনি সুরবালা চা নিয়ে এল, বললে—ঘুম হয়েচে ভালো? এর মধ্যে কাপাসডাঙা থেকে একটা রুগী এসেছিল,

বলে পাঠিয়েচি, বাবু ঘুমুচ্ছেন। তারা বোধ হয় এখনো বাইরে বসে আছে। শক্ত কেস্।

বললাম—আমাকে আজও মঙ্গলগঞ্জে যেতে হবে।

—অজও? কেন গা?

সুরবালা সাধারণত এরকম প্রশ্ন করে না। খাঁটি মিথ্যে কথা ওর সঙ্গে কখনো বলিনি। সংক্ষেপে বললাম—দরকার আছে। যেতেই হবে।

—কাপাসডাঙায় যাবে না?

—না। যেতে পারা যাবে না।

এদিকে কাপাসডাঙার লোকে যথেষ্ট পীড়াপীড়ি শুরু করে দিলে। তাদের রুগীর অবস্থা খারাপ, যত টাকা লাগে তা দেবে, অবস্থা ভালো, আমি একবার যেন যাই। ভেবে দেখলাম কাপাসডাঙার রুগী দেখতে গেলে সারা রাত কাটবে যেতে আসতে।

সে হয় না।

মাঝিকে নিয়ে সন্ধ্যার পরেই রওনা হই। মঙ্গলগঞ্জ পৌঁছবার আগে আমার বুকের মধ্যে কিসের ঢেউ যেন ঠেলে উঠচে বেশ অনুভব করি। মুখ শুকিয়ে আসচে। হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করচে। এ আবার কি অনুভূতি, আমার এত বয়স হোল, কখনও তো এমন হয়নি।

একটি ভয় মনের মধ্যে উঁকি মারছে। পান্না আজ হয়তো অন্য রকম হয়ে গেছে। আজ সে হয়তো আর

আমাকে চিনতেই পারবে না। তা যদি হয়, সে আঘাত বড় বাজবে বুকে।

গোবিন্দ দাঁ দেখি ডাক্তারখানায় বসে।

আমায় দেখেই দাঁত বের করে বললে—হেঁ হেঁ ডাক্তারবাবু যে! এসেচেন?

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছু নয়। ভাগ্যিস আপনি এলেন?

—আমি? কেন অসুখ বিসুখ কারো?

গোবিন্দ দাঁ স্বর নিচু করে বললে—অসুখ যার হবার, তার হয়েছে! একজন যে মরে। সকাল থেকে সতেরো বার এন্‌কুয়ারি করচে ডাক্তারবাবু আজ আসবেন তো? আপনি না এলে তার অবস্থা যে কেষ্ট-বিরহে রাধার মত।

রাগের সুরে বললাম—যাও, কি সব বাজে কথা বলো—

গোবিন্দ দাঁ টেবিল চাপড়ে বললে—একটুও বাজে কথা নয়। মা কালীর দিব্যি। আবদুল হামিদকে তো জানেন? ঘোড়েল লোক। ও যতবার সে ছুঁড়ির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছে, ততবার সে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আমি একবার গিয়েছিলাম কখন আসর হবে জিজ্ঞেস করতে। আমাকে বললে—ডাক্তারবাবু আজ আসবেন তো? আমি যেমন বলেছি, তা তো জানিনে আসবেন কি না, অমনি মুখ দেখি কালো হয়ে গেল।

আমার বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়চে। গোবিন্দ দাঁ হাবাক জিংকের ব্যবসা করে, মানুষের মনের খবর ও কি জানবে। জানলে এ সব কথা কি বলতো?

মুখে বললাম—ও সব কথা আমায় শুনিয়ে লাভ কি? যাও!

গোবিন্দ দাঁকে হঠাৎ একটি কথা জিজ্ঞেস করতে বড় ইচ্ছে হোল। কিন্তু জিজ্ঞেস করাটা উচিত কি না বুঝতে না পেরে একটু ইতস্তত করচি, দেখি ধূর্ত্ত গোবিন্দ দাঁ বললে—কিছু বললেন?

—একটা কথা। কাল রাত্তিরে ওকে তোমরা এনেছিলে কেন? ঠিক কথা বলবে?

—আমি বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না। ও আমাকে বললে, ডাক্তারবাবু কোথায় থাকেন? আবদুল হামিদও ছিল আমার সঙ্গে। তাই নিয়ে এসেছিলাম, হয় না হয় জিজ্ঞেস করে দেখবেন আবদুল হামিদকে। একবার নয়, ও ক'বার জিজ্ঞোস করেচে, আপনি কোথায় থাকেন। তখন বললাম—কেন? ও বললে হাত দেখাবো, অসুখ করেচে।

—ও কি করে জানলে আমি ডাক্তার? ও তো আসরে ছাড়া আমায় ছাখে নি?

—তা আমি জানিনে সত্যি বলচি, কাউকে হয়তো জিজ্ঞেস করে থাকবে।

কি একটি কথা বলতে যাবো এমন সময়ে বাইরে কে ডাকল—কে আছেন?

কম্পাউণ্ডার তখন আসেনি, আমি নিজেই বাইরে গিয়ে দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বললাম—কোথেকে

আসচো ? মনে হোল ওকে আমি খেমটা নাচের দলেই তবলা বাজাতে দেখেছি।

লোকটা বললে—ডাক্তারবাবু আছেন ?

বললাম—কি দরকার ?

—দরকার আছে ।

কি মনে হোল, বললাম—না, আসেন নি।

—ও ! আসবেন কি ?

—তা বলতে পারিনে।

গোবিন্দ দাঁ লোকটাকে দেখেনি, ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আমায় জিজ্ঞেস করলে—কে ? নেই বলে দিলেন কেন ? হয়তো শক্ত রোগ।

—তুমি থামো না ! আমার ব্যবসা আমি ভালই বুঝি।

এমন সময় নেপাল প্রামাণিক এসে হাত জোড় করে বললে—একটা অনুরোধ। বড়বৌ বিশেষ করে ধরেচে, যাও ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসো। রাত্তিরে যদি এখানে থাকতে হয়, তবে চলুন আমার কুটিরে। একটু কিছু খেয়ে আসবেন।

বেশ লোক এই নেপাল ও তার স্ত্রী। কিন্তু আজ আমার যাওয়ার তত ইচ্ছে ছিল না, গোবিন্দ দা বললে—যান না, নাচ শুরু হবে সেই দশটায়। হ্যাঁ, নেপালদা; বলি আমাদের মত গরীব লোকের কি জায়গা হয় না তোমাদের বাড়ী ?

নেপাল ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—হাঁ, হাঁ, চলো না, চলো।

আমরা সবাই মিলে নেপালের বাড়ী এসে চা খেলাম ; চায়ের সঙ্গে চিঁড়ে ভাজা ও নারকোল কোরা। একটু পরে

গোবিন্দ দাঁ উঠে চলে গেল। আমি একাই বসে আছি ; এমন সময়ে গোবিন্দ দাঁ আবার এল, আমায় বললে—একটু বাইরে আসুন।

—কি ?

—আপনি সেই যে লোকটাকে ডাক্তার নেই বলে দিয়েছিলেন, সে কে জানেন ? সে হোল ওদের খেমটার দলের লোক। আপনি আসবেন না শুনে পান্নার মন ভারী খারাপ হয়েছে।

—চুপ চুপ। এখানে কি ওসব কথা ? কে বললে তোমায় ?

—আরে গরীবের কথাটাই শুনুন। তিনি নিজেই আমাকে এই মাত্তর ডেকে বললেন—ডাক্তারবাবু এসেছেন কি না। দেখে আসচি বলে তাই চলে এলাম আপনার কাছে। এখন একটা মজা করা যাক। আমি গিয়ে বলি আপনি আসেন নি।

—তারপর ?

—তারপর আপনি হঠাৎ আসরে গিয়ে বসে প্যালা দিতে যাবেন। বেশ মজা হবে। কেমন ?

—না, ও আমার ভাল লাগে না। ও করে কি হবে ?

—করুন, করুন। আপনার হাতে ধরচি।

—বেশ, যাও, তাই হবে।

নেপালের ভক্তিমতী স্ত্রী খুব যত্ন করে আমাকে খাওয়ালো। বড় ভাল মেয়ে। সামনে বসে কখনো কথা বলে না, কিন্তু আড়াল থেকে সব সুখ সুবিধে দেখে গরম গরম লুচি এক

একখানা করে ভেজে পাতে দেওয়া, দুধ গরম আছে কি না দেখা, সব বিষয় নজর। দুদিন এখানে খেলাম, প্রতিদানে কি দেওয়া যায় তাই ভাবছি। একটা কিছু করা দরকার।

আহারাদির ঘণ্টা দুই পরে আসর বসলো। আমাকে গোবিন্দ দাঁ ডাকতে এল। ওর সঙ্গে গিয়ে আসরে বসলাম।

একটু পরে পান্না ও তার সঙ্গিনী সাজসজ্জা করে আসরে ঢুকলো। আমি লক্ষ্য করে দেখছি, পান্না এসেই আসরে চারিদিকে একবার দেখলে। আমি বসেচি আবদুল হামিদের পেছনে। প্রথমটা আমায় ও দেখতে পেলে না। ওর কৌতূহলী চোখ দুটি যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেল, সেটা আমার দৃষ্টি এড়ালো না।

পান্না গাইতে গাইতে কখনও পিছিয়ে যায়, কখনো এগিয়ে যায়। একটু পরে আমার মনে হল, ও সামনের দিকে মুখ উঁচু করে চেয়ে চেয়ে দেখছে। গোবিন্দ দাঁ আমাকে ঈষৎ ঠেলা দিয়ে মৃদুস্বরে কি বললে, ভাল শুনতে পেলাম না। ও কি সত্যি সত্যি আমাকে খুঁজচে? আমার কত বয়স হয়েচে, আর ও কতটুকু মেয়ে। আমার বিরহ অনুভব করবে ও মনের মধ্যে!

আর একটা নেশা আমায় পেয়ে বসলো। মদের নেশার চেয়েও বেশি। নাচের আসরে বসে আমি দুনিয়া ভুলে গেলাম। কেউ কোথাও নেই। আছে পান্না, আছি আমি। ঐ সুন্দরী কিশোরী আমাকে ভালবাসে। এ বিশ্বাস করিনি

এখনও মনে প্রাণে। তবুও ভাবতে ভাল লাগে, নেশা লাগে।

হয়তো এটা আমার দুর্ব্বলতা। আমার বুভুক্ষিত হৃদয়ের আকুতি। কখনো কেউ আমায় ও ভাবে ভালবাসেনি। সুরবালা? সে আছে, এই পর্য্যন্ত। কখনো তাকে দেখে আমার এমন নেশা আসেনি মনে।

নাচের আসর থেকে উঠে চলে এলাম, গোবিন্দ দাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ওরা কি বুঝবে আমার মনের খবর? ওরা স্থূল জিনিস দেখতে অভ্যস্ত, স্থূল জিনিস নিয়ে কারবার করতে অভ্যস্ত। ওদের ভাষা আমি বুঝি না।

ডাক্তারখানায় এসে দেখি, কেউ নাই। কম্পাউণ্ডার গিয়ে বসেছে খেমটার আসরে। চাকরটাও তাই। নিজে আলো জ্বালি, বসে বসে স্টোভ ধরিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি। পুরনো খবরের কাগজ একখানা পড়েছিল টেবিলে, তাই দেখি উলটে পালটে। ওই গোবিন্দ দাঁটা। আবার এসে টানাটানি না করে। ও কি বুঝবে আমার মনের খবর?

মাঝি কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে বললে—বাবু, চা খাচ্চেন, একটু দেবেন মোরে?

—কিসে করে খাবে? নিয়ে এসো একটা কিছু—

—নারিকোলের মালা একটা আনবো বাবু?

—যা হয় করো।

—বাবু, বাড়ী যাবেন না?

—না ! সকালের দিকে খোঁজ করিস। এখন ঘুমিয়ে নি গে যা—

মাঝির সঙ্গে কথা বলে যেন আমি বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এলাম। যে জগতে আমি গ্রাম্য ডাক্তারি করে খাই, সেখানে প্রেমও নেই, চাঁদের আলোও নেই, কোকিলের ডাকও নেই। কড়া চা খেয়ে ভাবি একটু ঘুমুবো, মাঝিও চলে গেল, সম্ভবত ঘুমুতে গেল। এমন সময় নেপাল দোর ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

বললাম—কি নেপাল, এত রাতে ?

—বাবু, আপনি শোবেন তা ভাবলাম এখানে মশারি নেই —আমার বাড়ী যদি—বৌ বলে দিলে—

—তোমার বৌ কোথায় ? খেমটার আসরে নাকি ?

নেপাল জিভ কেটে বললে—রামোঃ, বড়বৌ কক্ষনো ওসব শুনতে যায় না।

—শুনে বড় সুখী হলাম নেপাল। না যাওয়াই ভালো।

—বাবু, একটা কথা বলি, আবদুল হামিদ আর গোবিন্দর সঙ্গে আপনি মিশবেন না। ওরা লোক ভাল না।

—সে আমি জানি।

—বড় বৌও বলছিল—

—কি বলছিলেন ?

—বলছিল, ডাক্তারবাবুকে বলে দিও যেন ওদের সঙ্গে না মেশেন। ওরা কুপথে নিয়ে যাবে তাঁকে। কত লোককে যে ওরা খারাপ করেছে আমার চোখের ওপর, তা আর কি বলবো আপনাকে ডাক্তারবাবু। এই বাজারে ছিল হরি পোদ্দারের

ছেলে বিধু, তাকে ওরা মদে মেয়েমানুষে সর্ব্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিল।

—ও সব কিছু নয় নেপাল। নিজের ইচ্ছে না থাকলে কেউ কখনো কোথাও যায় না। ওসব ভুল কথা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আমায় খারাপ করতে পারে না জেনো। আমি যখন ওপথে নামবো, তখন নিজের ইচ্ছেতেই যাবো। লোকে বললেও যাবো, না বললেও যাবো।

—না, আমি এমনি কথার কথা বল্‌চি—মশারি দিয়ে যাই?

—আনতে পারো।

নেপাল চলে যাবার আধঘণ্টা পরে আবার কে দোর ঠেলচে দেখে খিল খুলে দিতে গেলাম। গিয়ে দেখি পান্না দাঁড়িয়ে বাইরে। আসরের সাজ পরনে। ঝলমল করচে রূপ, মুখে পাউডার, জরি পাড় চাঁপা রঙের শাড়ি পরনে, এক গোছা সোনার চুড়ি হাতে, ছোট্ট একটা মেয়েলি হাত-ঘড়ি চুড়ির গোছার আগায়, চোখে সুর্ম্মা। সঙ্গে কেউ নেই।

অবাক হয়ে বললাম—কি?

ও কিছু না বলে ঘরে ঢুকলো! বসলো একখানা চেয়ার নিজেই টেনে। আমার বুকের ভেতর তখন কিরকম করচে। আমি ওর দিকে এক দৃষ্টে চেয়েই আছি। পান্নাও কোন কথা বলে না। আমি একবার বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই।

[illegible] এসে একটু কড়াসুরে বললাম—কি মনে করে?

[illegible] আমার মুখের দিকে চোখ তুলে খা[illegible] চেয়ে রইল।

তারপর আবার চোখ নীচু করে ঘরের মেজের দিকে চাইল। কোন কথা বললে না। ঈষৎ হাসির রেখা ওর ওষ্ঠের প্রান্তে।

আমি বললাম—কিছু বললে না যে ?

—এলাম এমনি।

বলেই ও একটু হেসে আবার মুখ নীচু করে মেজের দিকে চাইলে।

বললাম—তুমি কি করে জানলে আমি এখানে ?

—আমি জানি।

—জানো মানে কি ? কে বলেচে ?

ও ছেলেমানুষের মত দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে—বলব না।

আমি রাগের সুরে বললাম—তুমি না বললেও আমি জানি। আবদুল হামিদ, না হয় গোবিন্দ দাঁ।

পান্না এবার আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে —না।

ও সত্যি কথা বলচে আমার মনে হোল। কৌতূহলের সুরে বললাম—তবে কে আমি জানতে চাই।

পান্না মুষ্টিবদ্ধ হাতে নিজের বুকে একটা ঘুষি মেরে বললে —এই !

—কি এই ?

—এইখানে জানতে পারে !

হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনি তা বুঝবেন না। বলেই আবার ও মুখ নীচু করে মেজের দিকে চাইলে—এবার শুধু মুখ নীচু নয় ঘাড় হুদ্ধ

নীচু। সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি। ওর অতি চমৎকার সুডোল লাবণ্যময় গ্রীবাদেশে সরু সোনার হার চিক্ চিক্ করচে, এলানো নামানো খোঁপা থেকে হেলা গোছা চুল এসে ঘাড়ের নীচের দিকে ব্লাউজের কাপড়ে ঠেকেচে। ওর মুখ দেখতে পাচ্চিনে—মনে হচ্চে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী লাবণ্যবতী কিশোরী আমার সামনে। ধরা দেবার সমস্ত লজ্জা ওর ঘাড় নীচু করার ভঙ্গির মধ্যে সুপরিস্ফুট। অল্পক্ষণের জন্যে নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম, কি হতো এ অবস্থা বেশিক্ষণ স্থায়ী হোলে, মনে আর কিছুক্ষণ স্থায়ী হোলে, তা আমি বলতে পারিনে, সে সময় আমার মনে পড়লো নেপাল মশারি নিয়ে যে-কোনো সময়ে এসে পড়তে পারে। আমি ব্যস্তভাবে ওর হাত ধরে চেয়ার থেকে জোর করে উঠিয়ে বললাম—তুমি এখুনি চলে যাও—

ও একটু ভয় পেয়ে গেল। বিস্ময়ের সুরে বললে—এখুনি যাবো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি।

—আমায় তাড়িয়ে দিচ্চেন ?

—এখুনি নেপাল আসবে মশারি নিয়ে। ওর বাড়ী থেকে মশারি আনতে গেল আমার জন্যে।

পান্নার চোখে ভয় ও না-বোঝার দৃষ্টিটা চকিতে কেটে গেল। ব্যাপারটা তখন ও বুঝতে পেরেচে। বললে—আপনি আসরে চলুন।

—না।

—কেন যাবেন না? আমি মাথা কুটবো আপনার সামনে এখুনি। আসুন।

—না।

—তবে দেখবেন? এই দেখুন—

সত্যিই ও হঠাৎ নিজের শরীরকে মাটির দিকে ঝুঁকিয়ে মেজের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—থাক্ থাক্, যাচ্ছি আসরে—তুমি যাও!

পান্না কোনো কথাটি আর না বলে ভালো মানুষের মত চলে গেল।

একটু পরেই নেপাল মশারি নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

বললে—কোথায় চললেন? ঘরে কিসের গন্ধ!

—কি?

নেপাল মুখ ইতস্তত ফিরিয়ে নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস টেনে টেনে বললে—সেণ্ট মেখেছেন বুঝি? সেণ্টের গন্ধ।

—তা হবে।

পান্নার কাণ্ড। সস্তা সেণ্ট মেখে এসে ঘরময় এই কীর্ত্তি করে গিয়েছে। তবুও গন্ধটা যেন বড় প্রিয় আমার কাছে। ও যেন কাছে কাছে রয়েছে ওই গন্ধের মধ্যে দিয়ে।

বললাম—শোব না। একটু আসরে যাচ্ছি।

—কি দেখতে যাবেন ডাক্তার বাবু। যাবেন না।

—তা হোক, কানের কাছে গোলমালে ঘুম হয় না। তার চেয়ে আসরে বসে থাকা ভালো।

—চলুন আমার বাড়ী শোবেন। বড়বৌ বড় খুশি হবে এখন।

—না। আসরে যাই একটু—

নেপালের ওপর মনে মনে বিরক্ত হই। তুমি বা তোমার বড়বৌ আমার গার্জেন নয়। আমিও কচি খোকা নই। বার বার এক কথা বলবার দরকার কি ?

একটু পরে আমি আসরে গিয়ে বসলাম। সামনেই পান্না। কিন্তু ওর দিকে যেন চাইতে পারচিনে। চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখচি। গোবিন্দ দাঁ, আবদুল হামিদ সবাই বসে। ওদের দলের মাঝখানে বসে আমার লজ্জা করতে লাগলো পান্নার দিকে চাইতে। পান্নাও আমার দিকে চেয়ে প্রথম বার সেই যে একবার মাত্র দেখলে, তারপর সেও আর আমার কাছে এলোও না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না।

অনেকক্ষণ পরে একবার চাইলে, ভীরু কিশোরীর সলজ্জ চোরা চাউনি তার প্রণয়ীর দিকে। এই চাউনি আমায় মাতাল করে দিলে একেবারে, আমার অভিজ্ঞতা ছিল না, ভগবান জানেন সুরবালা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে কখনো খারাপভাবে চোখ ফেলে চাইনি বা প্রেম করিনি। পাড়াগাঁয়ে ওসব নেইও অতশত। সুযোগ সুবিধার অভাবও বটে, তা ছাড়া আমার মত নীতিবাগীশের এদিকে রুচিও ছিল না। সলজ্জ লুকোনো চাউনির অদ্ভুত মাদকতা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই আমার থাকবার কথা নয়। আমার হঠাৎ বড় আনন্দ হোল। কেন

আনন্দ, কিসের আনন্দ সে সব আমি ভেবে দেখিনি, ভেবে দেখবার প্রবৃত্তি তখন আমার নেইও। অত্যন্ত আনন্দে গা-হাত-পা যেন বেলুনের মত হালকা হয়ে গেল। আমি যেন এখনি আকাশে উড়ে যেতে পারি। পৃথিবীতে সব চেয়ে সুখী মানুষ এই মুহূর্তে যদি কেউ থাকে তবে সে আমি। কারণ পান্নার ভালবাসা আমি লাভ করেছি।

ওই চাউনি আমায় বুঝিয়ে দিয়েচে সে কথা।

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পাগল করেচে ওই চিন্তা। আমার মনের মধ্যে আর একটা বুভুক্ষু মন ছিল, তার এতদিন সন্ধান পাইনি, আজ সে মন জেগে উঠেচে পান্নার মত রূপসী কিশোরীর স্পর্শে। আমার মত মধ্যবয়সী লোককে সতেরো-আঠারো বছরের একটি সুন্দরী কিশোরী ভালবেসে ফেলেচে—এ চিন্তা এক বোতল উগ্র সুরার চেয়েও মাদকতা আনে। যার ঠিক ওই বয়সে ওই অভিজ্ঞতা হয় নি, সে আমার কথা কিছুই বুঝতে পারবে না। জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। যে রস যে পায়নি, হাজার বর্ণনা দিলেও সে বুঝতে পারবে না সে রসের ব্যাপার। এই জন্যেই বলেচে, অনধিকারীর সঙ্গে কোন কথা বলতে নেই।

এমন একটি অনধিকারী এই গোবিন্দ দাঁ। আবদুল হামিদটাও তাই। স্থূল মনে ওদের অন্য কোনো রসের স্পর্শ লাগে না, স্থূল রস ছাড়া। আবদুল হামিদ দাঁত বের করে বললে—আপনি বড় বেরসিক ডাক্তারবাবু—

আমি বললাম—কেন?

—অমন মাল নিয়ে গেলাম আপনার ডাক্তারখানায়—আর আপনি—

—ওসব কথা এখানে কেন ?

—তাই বলচি।

গোবিন্দ দাঁ বললে—ছুঁড়িটা কিন্তু চমৎকার দেখতে, যাই বলুন ডাক্তারবাবু। আর কি ঢং কি হাসি মুখের, দেখুন না চেয়ে !

আবদুল হামিদ বললে—ডাক্তারবাবু ওর ওপর কেমন চটা। কই, আপনি তো ওর দিকে ফিরেও চাইচেন না ? অথচ দেখুন, আসর শুদ্ধ লোক ওর মুখের দিকে চেয় আছে—

আমি যে কেন ওর দিকে চাইচি না, কি করে বুঝবে ওই সব স্থুলবুদ্ধি লোক। আমি সব দিকে চাইতে পারি, শুধু চাইতে পারি না পান্নার মুখে। পান্নাও পারে না আমার দিকে চাইতে। এ তত্ত্ব বোঝা এদের পক্ষে বড়ই কঠিন।

আবদুল হামিদকে বললাম—বক্‌বক্‌ না করে চুপ করে থাকতে পারো না ?

গোবিন্দ দাঁ বললে—ডাক্তারবাবু আমাদের সাধুপুরুষ কি না, ও সব ভাল লাগে না ওঁর। ও রসে বঞ্চিত।

আমি উঠেই চলে যেতাম আসর থেকে, শুধু পান্নার চোখের মিনতি আমাকে আটকে রেখেচে ওখানে। ওদের কথাবার্ত্তা আমার ভাল লাগছিল না মোটে।

আবদুল হামিদ আমার সামনে রুমালে বেঁধে ছুটাকা প্যালা দিলে—আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দিলে। আমি ভাবলাম

না প্যালা দিতে। পান্নার সঙ্গে সেরকম ব্যবসাদারি করতে আমার বাঁধে।

আমি বললাম—এ ক'দিনে যে অনেক টাকা প্যালা দিলে আবদুল—

আবদুল হামিদ বললে—টাকা দিয়ে সুখ এখানে, কি বলেন ডাক্তারবাবু? কত টাকা তো কতদিকে যাচ্ছে।

—সে তো বটেই, টাকা ধন্য হয়ে গেল।

—ঠাট্টা করচেন বুঝি? আপনিও তো টাকা দিয়েচেন।

—কেন দেবো না?

—তবে আমাকে যে বলচেন বড়?

—কিছু বলচি নে। যা খুশি করতে পারো।

গোবিন্দ দাঁ বললে—ওসব কথা বোলো না ডাক্তারবাবুকে। উনি অন্য ধাতের লোক। রসের কৌটাও নেই ওঁর মধ্যে।

আবদুল একচোট হো হো করে হেসে নিয়ে বললে—ঠিক কথা দাঁ মশায়। অথচ বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট। আমাদের এ বয়সে যা আছে, ওঁর তাও নেই।

আমি কাউকে কিছু না বলে ডিস্‌পেন্‌সারিতে চলে গেলাম। মাঝিটা অঘোরে ঘুমুচ্চে। তাকে আর ওঠালাম না। নিজেরও ঘুম পেয়েচে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে এমন একটা গোলমালের সৃষ্টি করেচে যে ঘুম প্রায় অসম্ভব। আমি ব্যাপারটাকে ভাল করে ভেবে দেখবার অবকাশ পেয়েও পাচ্ছিনে। মন এখান থেকে একটা ভাল টুকরো, ওখান

থেকে আর এক টুকরো নিয়ে আস্বাদ করেই মশগুল, সমস্ত জিনিসটা ভেবে দেখবার তার সময় নেই।

এমন সময় দোরে মৃদু ঘা পড়লো। আমার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। আমি বুঝেচি কে এত রাত্রে দরজায় ঘা দিতে পারে।

পান্নার গায়ে একখানা সিল্কের চাদর। খোঁপা এলিয়ে প্রায় কাঁধের ওপর পড়েচে, চোখ দুটোতে উত্তেজনা ও উদ্বেগের দৃষ্টি। সে যেন আশা করেনি আমায় এখন দেখতে পাবে। দেখে যেন আশ্বস্ত হয়েছে। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আমি বললাম—কি ?

পান্না চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, একবার ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, বললে—এলাম আপনার এখানে।

—তা তো দেখতে পাচ্ছি, কি মনে করে ?

—দেখতে এসেছি, মাইরি বলছি।

—বেশ। দেখে চলে যাও—

—তাড়িয়ে দিচ্চেন ?

—হাঁ।

—আপনি বড় নিষ্ঠুর, সত্যি—

আমি হেসে ফেললাম। বললাম—আমি না তুমি ? তুমি জানো এখানে আসা কত অন্যায় ?

—তবুও আসি কেন, এই তো ?

—ঠিক তাই।

—যদি বলি, না এসে থাকতে পারিনে ?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কি করলে বিশ্বাস হয়? আমি এই দেয়ালে মাথা কুটবো। দেখুন—

পান্না সত্যিই দেয়ালের দিকে এগিয়ে যায় দেখে আমি গিয়ে ওর হাত ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে কি হোল, তীব্র একটা বৈদ্যুতিক স্পর্শে যেন আমার সারা দেহ ঝিমঝিমিয়ে উঠলো। সুরবালাকে ছাড়া আমি কোন মেয়েকে স্পর্শ করিনি তা নয়। আমি ডাক্তার মানুষ, ব্যবসার খাতিরে কতবার কত মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রোগ পরীক্ষা করতে হয়েচে, কিন্তু এমন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সঞ্চালিত হয়নি সারা দেহে।

পান্না ফিক্ করে হেসে বললে—ছুঁলেন যে বড়?

বললাম—কেন ছোঁব না? তুমি মেথর নও তো—

—আপনার চোখে তাদের চেয়েও অধম।

—বেশ, যদি তাই হয়, তবে এলে কেন?

—ওই যে আগে বললাম, আমার মরণ, থাকতে পারিনি।

—কেন গোবিন্দ দাঁ, আবদুল হামিদ?

—আমি ঠিক এবার মাথা কুটবো আপনার পায়ে। আর বলবেন না ও কথা।

পান্না খুব দৃঢ়স্বরে এই কথাগুলি বললে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে আবার।

আমি বললাম—কি দেখচো?

—ঘরে কেউ নেই? আপনি একা?

—কেন বল তো?

—তাই বলচি।

—না। মাঝি ঘুমুচ্চে বাইরের বারন্দায়।

—আপনার বাড়ী কোথায় ?

—এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নৌকো করে যাতায়াত করি।

—আপনার নৌকোর মাঝি ? ওকে বিদায় করে দিন।

—বারে, কেন বিদেয় করবো

পান্না মুখ নিচু করে চুপ করে রইল। জবাব দিলে না আমার কথার। আমি বললাম—শোনো, তুমি এখান থেকে যাও।

পান্না বললে—তাড়িয়ে দিচ্চেন ?

—দিচ্চিই তো।

—আচ্ছা, আপনার মনে এতটুকু কষ্ট হয় না যে আমি যেচে যেচে—

এই পর্য্যন্ত বলেই পান্না হঠাৎ থেমে গেল। ওর ব্রীড়া-মূর্চ্ছিত হাসিটুকু বেশ দেখতে।

আমি বললাম—আচ্ছা, বসো পান্না।

পান্না মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসলে। চোখের চাউনিতে আনন্দ। যে চেয়ারখানা ধরে সে দাঁড়িয়েছিল, সেই চেয়ারটাতেই বসে পড়লো। ঘরের কোনো দিকে কেউ নেই নির্জ্জন রাত্রি। বর্ষার মেঘ জমেছে আকাশে শেষ রাতের শেষ প্রহরে, খোলা জায়গা দিয়ে দেখতে পাচ্চি। পান্না এত কাছে, এই নির্জ্জন স্থানে, নিজে সেধে ধরা দিতে এসেছে। আমার

শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো। বৃদ্ধ হয়ে পড়িনি এখনো ?
পান্না চেয়ারে বসে সলজ্জ হাসি হাসলে আবার। ওর মুখে এমন হাসি আমি আজ রাত্রেই প্রথম দেখেচি। পুরুষের সাধ্য নেই এই হাসির মোহকে জয় করে। চেয়ারের হাতলে রাখা পান্না সুডৌল, সুগৌর, সালঙ্কার বাহু আমার দিকে ঈষৎ এগিয়ে দিলে, হয় তো অন্যমনস্ক হয়েই। কেউ কোনো কথা বলচি না, ঘরের বাতাস থম থম করছে—যেন কিসের প্রতীক্ষায়। নাগিনী কুহক দৃষ্টিতে আকর্ষণ করচে তার শিকারকে।

এমন সময়ে বাইরের বারান্দাতে মাঝিটার জেগে ওঠবার সাড়া পাওয়া গেল। সে হাই তুলে তুড়ি দিচ্চে, এর কারণ ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি এসেচে বাইরে। বৃষ্টির ছাটে মাঝির ঘুম ভেঙেচে।

আমার চমক ভেঙে গেল, মোহগ্রস্ত ভাব পলকে কেটে যেতে আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পান্নাও উঠে দাঁড়ালো। শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—ও কে ?

—আমার মাঝি। সেই তো যার কথা বলেছিলাম খানিক আগে।

—ও ঘরে আসবে নাকি।

—নিশ্চয়ই

—আমি তবে এখন যাই। আপনি যাবেন না থাকবেন ?

—যাবো।

—না, যাবেন না। আজ আমাদের শেষ দিন। কাল চলে

যাবো। আপনাকে থাকতে হবে। আমার মাথার দিব্যি। আমি আসবো আবার। কখনো যাবেন না।

হেসে বললাম—তুমি হিপনটিজম্ করা অভ্যেস করেচ নাকি? ও রকম বার বার করে একটা কথা বলচো কেন?

—সে আবার কি?

—সে একটা জিনিস। তাতে যে-কোনো লোককে বশ করা যায়।

—সত্যি? শিখিয়ে দেবেন আমাকে সে জিনিসটা?

মনে মনে বললাম—সে আমাকে শেখাতে হবে না। সে তুমি ভীষণভাবে জানো।

পান্না সামনের দোর খুলে বেরিয়ে গেল চট্ করে।

রাত কতটা ছিল আমার খেয়াল হয়নি। সে খেয়াল ছিলও না। পান্না চলে গেলে মনে হোল আমার সমস্ত সত্তা যেন ও আকর্ষণ করে নিয়ে চলে গেল। মেয়েমানুষের আকর্ষণে এমন হয় তা কোনো দিন আমার ধারণা নেই। সুরবালাও তো মেয়েমানুষ, কিন্তু তার আসঙ্গ লিপ্সা আমাকে এমন কুহক জালে ফেলেনি কোনো দিন। মনের মধ্যে পান্নার চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা স্থান পায় তার সাধ্য কি। জীবনের এ এক অদ্ভুত ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা। আজ মনে পড়লো, রামপ্রসাদ ও শান্তির কথা। বেচারী রামপ্রসাদের বোধ হয় এমনি অবস্থা হয়েছিল, তখন আমার অমন অবস্থা হয় নি, আমি ওর মনের খবর কেমন করে জানবো?

পান্নার কি আছে তাও জানি না। এমন কিছু অপূর্ব ধরণের রূপসী সে নয়। অমন মেয়ে আর কখনও দেখিনি, এ কথাও অবিশ্বাস্য। সুরবালা যখন নববধূরূপে এসেছিল আমাদের বাড়ি, তখন ওর চেয়ে অনেক রূপসী ছিল, এখন অবিশ্যি তার বয়স অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে এখন আর তেমন রূপ নেই। কিন্তু ওসব কিছু নয় আমি জানি। পান্নার রূপ ওর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, ওর মুখের শ্রীতে, ওর চোখের চাউনিতে, ওর মাথার চুলের ঢেউ খেলানো নিবিড়তায়, ওর চটুল হাসিতে, ওর হাত-পায়ের লাস্যভঙ্গিতে। মুখে বলা যায় না সে কি। অথচ তা পুরুষকে কি ভীষণভাবে আকর্ষণ করে—আর আমার মত পুরুষকে, যে কখনও ছাত্রবয়সেও মেয়েদের ত্রিসীমানা মাড়ায় নি। মেডিকেল কলেজে পড়বার সময় মিস্ রোজার্স বলে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্সকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে কত দ্বন্দ্ব, কত নাচানাচি, কত রেষারেষি চলতো। কে তাকে নিয়ে সিনেমা ত বেরুতে পারে, কে তাকে একদিন হোটেলে খাওয়াতে পারে—এই নিয়ে কত প্রতিযোগিতা চলতো—আমি ঘৃণার সঙ্গে দূর থেকে সে সুন্দ-উপসুন্দর যুদ্ধ দেখেছি। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যে কখনও এমন হতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

এখন বুঝেছি, মেয়েদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে, সব মেয়ে সব পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে না। কে কাকে যে টানবে, সে কথা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। আচ্ছা, শান্তিও তো চটুল মেয়ে আমাদের গ্রামের, শুনতে পাই অনেক পুরুষকে

সে নাচিয়েচে, কিন্তু একদিনও তাকে বোন্ ছাড়া অন্য চোখে দেখিনি।

মাঝি উঠে এসে বললে—বাবু, বাড়ি যাবেন নাকি ?

—না, আজ আর যাবো না।

—বাড়িতে ভাববেন।

—তুই যা না কেন, আমি একখানা চিঠি দিচ্চি।

—তার চেয়ে বাবু, আমি বলি, আপনি চলুন না কেন। আমি আবার আপনাকে দুপুরের পর পৌঁছে দেবো।

—আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি, তুই বাইরে বোস্।

ফরসা হয়ে গেল রাত। সঙ্গে সঙ্গে রাতের মোহ যেন খানিকটা কেটে গেল। মনে মনে ভাবলাম—যাই না কেন বাড়িতে। সুরবালার সঙ্গে দেখা করে আবার আসবো এখন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হোল না, নিয়তির ফল বোধ হয় খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। যদি যেতাম বাড়িতে মাঝির কথায়, তবে হয় তো ঘটনার স্রোত অন্য দিকে বইতো। কিন্তু আমি ডাক্তারি পাশ করেছিলাম বটে মেডিকেল কলেজ থেকে, তবুও আমি মূর্খ। ডাক্তারি শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনো শাস্ত্র আমি পড়িনি, ভালো ভালো কথা কোনো দিন আমায় কেউ শোনায় নি, জীবনের জটিলতা ও গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার। সরল ও অনভিজ্ঞ মন নিয়ে পাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর [illegible] হাত দেখে বেড়াই।

যাওয়া হোলো না, কারণ গোবিন্দ দাঁ ও আবদুল হামিদ এসে প্রস্তাব করলে আর একটা [illegible] আয়োজন করা

যাক। আমি দেখলাম যদি পিছিয়ে যাই তবে ওরা বলবে ডাক্তার টাকা দিতে হবে বলে পিছিয়ে গেল। ওদের মদনগঞ্জ থেকে বছরে অনেক টাকা আমি উপার্জন করি, তার কিছু অংশ ন্যায্য আমোদ-প্রমোদের জন্যে দাবি করতে পারে

বললাম—কি করতে চাও? যা চাও দেবো।

আবদুল হামিদ বললে—ভাল একটা ফিষ্টি।

গোবিন্দ দাঁ বললে—আপনার নৌকাটা নিয়ে চলুন মহানন্দ পাড়ার চরে। দুটো মুরগি যোগাড় করা হয়েচে, আরও দুটো নেবো। পোলাও, না ঘি-ভাত না লুচি যা-কিছু বলবেন আপনি।

আমি বললাম—আমি দাম দিয়ে দিচ্চি জিনিস পত্তরের। তবে আমাকে জড়িও না। দুজনেই সমস্বরে হৈ চৈ করে উঠলো। তা কখনো নাকি হয় না। আমাকে বাদ দিয়ে তারা স্বর্গে যেতেও রাজী নয়।

গোবিন্দ দাঁ বললে—কেন, মুর্গিতে আপত্তি? বলুন, ও বাদ দিয়ে সেখহাটি থেকে উত্তম মণ্ডলের ভেড়া নিয়ে আসি। পনেরো সের মাংস হবে।

আমি বললাম—আমায় বাদ দাও।

—কেন, বলুন।

খুব সামলে গেলাম এ সময়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে-ছিল আর একটু হলে যে, আমার মন ভাল নয়। ভাগ্যিস্ সে কথা উচ্চারণ করিনি। ওরা তখুনি বুঝে নিত। ঘুঘু লোক সব। বললাম—শরীর বড় খারাপ হয়েচে।

গোবিন্দ দা তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—দিন, দিন, দশটা টাকা ভেলে দিন। শরীর খারাপ টারাপ কিছু নয়, ও আমরা দেখবো এখন। মাছের চেষ্টায় যেতে হবে। তা হোলে আপনার নৌকো ঠিক রইল কিন্তু।

—মাঝিকে বাড়ি পাঠাবো ভেবেছি। আমি যাচ্ছিনে খবরটা দিতে হবে তো।

—কালও তো যান নি।

—যাইনি বলেই আজ আরও বেশি করে খবর পাঠান দরকার।

গোবিন্দ দা বললে—আমি সাইকেলে লোক পাঠাচ্ছি এক্ষুনি।

সব ঠিকঠাক হোল। ওদের রুচিমত ওদের পিকনিক হবে, এতে আমার মতামতের কোন স্থান নেই, মূল্যও নেই। কিন্তু আমি ঘোর আপত্তি জানালাম যখন বুঝতে পারলাম যে ওদের নিতান্ত ইচ্ছে, পান্নাকে নিয়ে যাবে আমার নৌকো করে পিকনিকের মাঠে। ওরাও নাছোড়বান্দা। আমি শেষে বললাম, ওরা নিয়ে যেতে চায় পান্নাকে খুব ভালো, আমি যাবো না সেখানে।

গোবিন্দা দা বললে—কেন এতে আপত্তি করছেন ডাক্তার-বাবু?

—না। তোমরা পান্নাকে পিকনিক-সহচরী করতে চাও—ভালো। আমাকে বাদ [illegible]

—সে কি হয় ডাক্তারবাবু? তবে পান্নাকে বাদ দেওয়া যাক, কি বল প্রেসিডেন্ট সাহেব?

প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ (নসরাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের) একগাল অমায়িক হাসি হেসে বললে—নাঃ, ও পান্না টান্নাকে বাদ দিতে পারি, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে—কক্ষনো না।

আমি কৃতার্থ হই। যথারীতি ওদের স্থূলরুচি অনুযায়ী বনভোজন সম্পন্ন হোল। সন্ধ্যার আগে ওরা তাড়াতাড়ি ফিরলো আসরে যাবে বলে। আমি গেলুম ওদের সঙ্গে। সেই রাত্রে পান্না আবার আমার ডাক্তারখানায় এসে হাজির। আমি জানতাম ও ঠিক আসবে, মনে মনে ওর প্রতীক্ষা করিনি এ কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। আমার সমস্ত মনপ্রাণ ওর উপস্থিতি কামনা করেনি কি?

ও এসেই হাসিমুখে সহজ সুরে বললে—আসরে যাওয়া হয়নি যে বড়?

অদ্ভুতভাবে দুষ্টু মেয়ের মত চোখ নাচিয়ে ও প্রশ্নটা করলে। এখন যেন ও আমাকে আর সমীহ করে না। আমার খুব কাছে যেন এসে গিয়েচে ও। যেন কতদিনের বন্ধুত্ব ওর সঙ্গে, কতকাল থেকে আমাকে চেনে। বললাম—বোসো।

ও গালে হাত দিয়ে কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলল—ওমা, কি ভাগ্যি! আমাকে আবার বসতে বলা! কক্ষনো তো শুনিনি।

আমি হেসে বললাম···ক'দিন তোমার সঙ্গে আলাপ, পান্না? এর মধ্যে বসতে বলবার অবকাশই বা ক'বার ঘটলো?

—ভালো, ভালো। আবার নাম ধরেও ডাকা হোলো! ওমা, কার মুখ দেখে না জানি আজ উঠেছিলুম, রোজ রোজ তার মুখই দেখবো।

—মতলব কি এঁটে এসেচ বল দিকি?

পান্না হাসিমুখে ঘাড় একদিকে ঈষৎ হেলিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—ভয়ে বলবো, না নির্ভয়ে বলবো?

—নির্ভয়ে বলো।

—ঠিক?

—ঠিক।

—আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন। আজই, এখুনি—

কথা শেষ করে ছুটে এসে আমার পায়ের কাছে পড়ে ফুলের মত মুখ উঁচু করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—চলুন।

ওর চোখে মিনতি ও করুণ আবেদন।

অপূর্ব্ব রূপে পান্না যেন ঝলমল করে উঠলো সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে। পান্না যেন সুন্দরী মৎস্যনারী, অনেক-দূরের অথৈজলে টানচে আমাকে ওর কুহক দৃষ্টি।

সেই ভোর রাত্রেই পান্নার সঙ্গে আমি কলকাতা রওনা হই।

পান্না ও আমি একা এক গাড়ীতে!

ওর সে সহচরী কোথায় গেল তা আমি দেখিনি। তাকে ও তত গ্রাহ্য করে বলে মনেও হোল না। তার বয়স বেশি, তাকে কেউ সুনজরে বড় একটা দেখে না।

গাড়ীতে উঠে পান্না আমার সামনের বেঞ্চিতে বসলো। হু হু করে গাড়ী চলেচে, গাছপালা, গরু, পাখী, ঝোপঝাপ সট্‌সট্‌ করে বিপরীত দিকে চলে যাচ্চে, স্টেশনের পর স্টেশন যাচ্চে আসচে।

আমার কোনো দিকে নজর নেই।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি, বেশি কথা বলতে পাচ্চিনে ওর সঙ্গে, কারণ গাড়ীতে লোক উঠচে মাঝে মাঝে। এক একবার খুব ভিড় হয়ে যাচ্চে, এক একবার গাড়ী ফাঁকা হয়ে যাচ্চে। তখন পান্না আমার দিকে অনুরাগ ভরা দৃষ্টি মেলে চাইচে।

মদের চেয়েও তার তীব্র নেশা।

এক স্টেশনে পান্না বললে—তাহোলে ?

ওর সেই বদমাইশ ধরনের চোখ নাচিয়ে কথাটা শেষ করে। আমি জানি, পান্না খুব বদমাইশ মেয়ে, আমি ওকে দেবী বলে ভুল করিনি মোটেই। দেবী হয় সুরবালাদের দল। দেবীদের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই বর্ত্তমানে। দেবীরা এমন চোখ নাচাতে পারে ? এমন বদমাশির হাসি হাসতে পারে ? এমন ভালমানুষকে টেনে নিয়ে ঘরের বার করতে পারে ? এমন পাগল করে দিতে পারে রূপে ও লাবণ্যের [illegible] ?

দেবীদের দোষ, মানুষকে এরা আকৃষ্ট করতে পারে না। শুধু দেবী নিয়ে কি ধুয়ে খাবো ? আমার গোটা প্রথম যৌবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েচে দেবীদের সংস্পর্শে। দূর থেকে ওদের নমস্কার করি।

পান্না যে প্রশ্ন করলে, তার উত্তর আমি দিলাম না।

আমি এখন ওর প্রশ্নের উত্তর দিবার অবস্থায় নেই। আমার মন যেন অসীম অনন্ত আকাশে নিরবলম্ব গ্রহণে বেরিয়েচে। দুরন্ত সে পথ-যাত্রা। পান্না যে আগ্রহ জাগিয়েচে কিন্তু তা পরিতৃপ্ত করতে পারবে কি?

পান্নার মুখে আবার সেই বদমাশি হাসি। বললে—উত্তর দিলেন না যে?

আমি বললাম—পান্না, তুমি আমার সঙ্গে কতদূর যেতে পারবে?

ও হাসি হাসি মুখে বললে—কেন?

—কলকাতায় গিয়েও কাজ নেই।

—সে কি কথা, কোথায় যাবো তবে?

—আমি যেখানে বলবো।

—কলকাতায় যাবো না—তবে আমার বাসাবাড়ি, জিনিস-পত্তর কি হবে? থাকবো কোথায় বলুন?

—ও সব ভাবনা যদি ভাববে তবে আমায় নিয়ে এলে কেন?

—আপনার কি ইচ্ছে বলুন।

—বলবো পান্না? পারবে তা?

—হাঁ, বলুন।

—আমার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসতে পারবে?

পান্না ঘাড় একদিকে বেঁকিয়ে বললে—কোথায়?

—যেখানে খুশি। যেখানে কেউ থাকবে না, তুমি আর আমি শুধু থাকবো। যেখানে হয়, যত দূরে—

—হু-উ-উ-উ—

—ঠিক ?

—ঠিক।

বলেই ও আবার আগের মত হাসি হাসলে।

ওর ওই হাসিই আমাকে এমন চঞ্চল, এমন ছন্নছাড়া করে তুলেচে। নিরীহ গ্রাম্যডাক্তার থেকে আমি দুঃসাহসী হয়ে উঠেচি—ওই হাসির মাদকতায়। বললাম—সব ভাসিয়ে দিতে রাজী আছ আমার সঙ্গে বেরিয়ে ?

—সব ভাসিয়ে দিতে রাজী আছি আপনার সঙ্গে—

বলেই ও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

গাড়ীতে এই সময়টায় কেউ নেই। আমি ওর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বললাম—তাহোলে কলকাতায় কেন ?

—না। আপনি যেখানে বলেন—

—ভেবে ত্যাখো। সব ছাড়তে হবে কিন্তু। খেমটা নাচতে পারবে না। টাকাকড়ি রোজগার করতে পারবে না।

পান্না যদি তখন বলতো, 'খাবো কি'—তবে আমার নেশা কেটে যেতো, শূন্য থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে বেঁচে যেতাম তখুনি। কিন্তু পান্নার মুখ দিয়ে সে কথা বেরুলো না। সে ঘাড় দুলিয়ে বললে—এবং বললে অতি অদ্ভুত কথা, অদ্ভুত সুরে। বললে—তুমি আর আমি একা থাকবো। যেখানে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়—মুজরা করতে দাও করবো, না করতে দাও, তুমি যা করতে বলবে করবো—

আমি তখন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছি, প্রেমের ও মোহের নিষ্ঠুরতায় —ওর মুখে 'তুমি' সম্বোধনে। আমি বলি—যদি গাছতলায় রাখি ? না খেতে দিই ?

—মেরে ফেলো আমাকে। তোমার হাতে মেরো। টুঁ শব্দটি যদি করি তবে বোলো, পান্না খারাপ মেয়ে ছিল।

—তোমার আত্মীয় স্বজন ?

—কেউ নেই আমার আত্মীয় স্বজন।

—তোমার মা নেই ?

পান্না তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্‌টে দুর্দান্ত বিদ্রোহের সুরে বললে—ভারী মা !

—বেশ চলো তবে। যা হয় হবে। আমি কিন্তু পয়সা নিয়ে বার হইনি, তা তুমি জানো।

—আবার ওই কথা ?

বেলা তিনটের সময় ট্রেন শেয়ালদ' পৌঁছুলে স্টেশন থেকে সোজা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ভবানীপুর অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র গলিতে পান্নার বাসায় গিয়ে ওঠা গেল।

রাত্রে আমার ভাল ঘুম হোল না। আমি এমন জায়গায় কখনো রাত কাটাইনি। পল্লীটা খুব ভাল শ্রেণীর নয়, লোক যে না ঘুমিয়ে সারা রাত ধরে গান বাজনা করে, এও আমার জানা ছিল না। সকালে উঠে পান্নাকে বললাম—পান্না, আমি এখানে থাকবো না।

পান্না বিস্ময়ের সুরে বললে—কেন ?

—এখানে মানুষ থাকে ?

—চিরকাল তো এখানে কাটালুম।

—তুমি পারো, আমার কর্ম্ম নয়।

—আমি কি করবো তুমিই বলো। আমার কি উপায় আছে?

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। একটু পরে বেলা হোলে এক প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকে আমার দিকে দু-একবার চেয়ে দেখে আবার চলে গেল। পান্না কোথায় গেল তাও জানিনে, একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

বেলা ন'টার সময় প্রৌঢ়াটি আবার ঘরে ঢুকে আমায় বললে—আপনার বাড়ী কোথায়?

এ প্রশ্ন আমার ভাল লাগলো না। বললাম—কেন?

—তাই শুধুচ্চি।

—যশোর জেলায়।

বুড়ী বসে পড়লো ঘরের মেজেতে। সে ঘরের মেজেতে সবটা গদি তোশক পাতা, তার ওপরে ধবধবে চাদর বিছানো, এক কোণে দুটো রূপোর পরী তাদের হাতে হুঁকো রাখবার খোল। দেওয়ালে দুটো ঢাকনি পরানো সেতার কিংবা তানপুরো, ভালো বুঝি না। পাঁচ-ছ'খানা ছবি টাঙানো দেওয়ালে। এক কোণে চৌকি পাতা, তার ওপরে পুরু গদিপাতা বিছানা, ঝালর বসানো মশারি, বড় একটা কাঁসার পিকদান চৌকির তলায়। ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকা সত্ত্বেও মনে হয় সবটা মিলে অমার্জিত রুচির পরিচয় দিচ্ছে, বহুকালের শান্তশ্রী এখানে নেই।

বুড়ী বললে—[illegible] দিন থাকবে বাবা ?

—কেন বলুন তো ?

—পান্না তোমাদের দেশে গান করতে গিয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—তাই বেন তুমি ওর সঙ্গে এসেচ পৌঁছে দিতে ?

—তাই ধরুন আর কি।

—একটা কথা বলি। পষ্ট কথার কষ্ট নেই। এ ঘরে তুমি থাকতে পারবে না। ওকে রোজগার করতে হবে, ব্যবসা চালাতে হবে। ওর এখানে লোক যায় আসে, তারা পয়সা দেয়। তুমি ঘরে থাকলে তারা আসবে না। যা বলো আমি পষ্ট কথা বলবো বাপু! এতে তুমি রাগই করো, আর যাই করো। এসেচ দেশ থেকে ওকে পৌঁছে দিতে, বেশ। পৌঁছে দিয়েচ, এখন দু'-একদিন শহরে থাকো, দেখো শোনো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—আমি যা বুঝি। চিড়িয়াখানা দেখেচ ? মুসায়েড্ দেখেচ ? না দেখে থাকো আজ দুপুরে গিয়ে দেখে এস—

এই সময় পান্না ঘরে ঢুকে বুড়ীর দিকে চেয়ে বললে—মাসী, ঘরে বসে কি বলচো ওঁকে ?

বুড়ী ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—কি আবার বলবো ? বলচি ভালো মনুষের ছেলে, কলকেতা শহরে এসেচ, শহর দেখে দু'দিন দেখাশুনো করে বাড়ি চলে যাও। পৌঁছে তো দিয়েচ, এখন দেখো শোনো দুদিন, খাও মাখো—আমি তো না বলচিনে বাপু! ও ছুঁড়ি যখনই বাইরে যায়, তখনই [illegible]

পেছনে কেউ না কেউ—সেবার ঝুলনে গেল, সঙ্গে এল সেই পরেশবাবু। পোড়ার মুখো নড়তে আর চায় না। পনেরো দিন হয়ে গেল, তবু নড়ে না—বলে, পান্নার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও মাসী—সে কি কেলেঙ্কারী! তবে পান্না তাকে মোটেই আমল দেয়নি, তাই সে [illegible]কতে পারলো না—নইলে বাপু, তা অমন কত এল, কত গেল।

পান্না বললে—আঃ মাসী, কি বলচো বসে বসে? যাও—

বুড়ী হাত-পা নেড়ে বললে—যাবো না কি থাকতে এসেচি? তোমার ঘাড়ে বাসা বেঁধে বসেচি? এখন অল্প বয়েস, বয়েস দোষ যে ভয়ানক জিনিস। হিত কথা শুনবি তো এই মাসীর মুখেই শুনবি—বেচাল দেখলে রাশ আর কে টানতে যাবে কার দায় পড়েচে?

বুড়ী গজ্ গজ্ করতে করতে উঠে চলে গেল।

আমি পান্নাকে অনেকক্ষণ দেখিনি। অনুযোগের সুরে বললাম—আমি বাড়ি চলে যাব আজ, ঠিক বলচি—

—কেন? কেন? ওই বুড়ীর কথায়! তুমি—

—সে জন্যে না। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

—এই!

পান্না মুখে কাপড় দিয়ে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

আমি রাগের সঙ্গে বললাম—হাসচো যে বড়?

ও বললে—তোমার কথা শুনলে না হেসে থাকা যায় না। তুমি ঠিক ছেলেমানুষের মত। আমি এমন মানুষ যদি কখনো দেখেচি!

বলেই হাত দুটো অসহায় হাস্তের ভঙ্গিতে ওপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলবার মত তুলে আবার হাসতে লাগলো।

ওই সেই অপূর্ব্ব ভঙ্গি হাত ছোঁড়ার, সারা দেহের ঝলমলে লাবণ্য, মুখের হাসি আমাকে সব ভুলিয়ে দিলে। ও আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বললে—তুমি চলে গেলেই হোল! সাইরি! পায়ে মাথা কুটবো না?

আমাকে ও চা দিয়ে গেল। বললে—খাবে কিছু?

সুরবালার কথা মনে পড়লো। সুরবালা এমন বলতো না, খাবার নিয়ে এসে রাখতো সামনে। আমি জানি এদের সঙ্গে সুরবালাদের তফাৎ কত। না জেনে বোকার মত আসিনি। সুরবালা সুরবালা, পান্না পান্না—এ নিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বাক্যবিন্যাস করে কোনো লাভ নেই। পান্না খাবার নিয়ে এল। চারিখানা তেলে ভাজা নিমকি, এক মুঠো ঘুগনি দানা, দুখানা পাঁপর ভাজা। এই প্রথম ওর হাতের জিনিস আমাকে খেতে হবে। মন প্রথমটা বিদ্রোহ করে উঠেছিল—কিন্তু তার পরেই শান্ত হয়ে এল। কেন খাবো না ওর হাতে?

একটা কথা আমার মনে খচ্‌খচ করে বাজছিল। পান্নার ঘরে লোক আসে রাত্রে, বুড়ী বলছিল। যতবার এই কথাটা মনে ভাবি, ততবার যেন আমার মনে কি কাঁটার মত বাজে।

বললাম কথাটা পান্নাকে।

পান্না বললে, কি করতে বলো আমায়?

—এ সব ছেড়ে দাও।

হয় পান্না খুব চালাক মেয়ে, নয় আমার অদৃষ্টলিপি—আবার পান্না বললে—যা তুমি বলবে—

সে বললে না, 'খাবো কি' 'চলবে কিসে' প্রভৃতি নিতান্ত রোমান্স বর্জ্জিত বস্তুতান্ত্রিক কথা। কেন বললে না কতবার ভেবেছি। বললেই আমার নেশা তখুনি সেই মুহূর্ত্তেই ছুটে যেতো। কিন্তু পান্না তা বললে না। প্রতিমার মাটির তৈরী পা ও আমাকে দেখতে দিলে না।

দু-দুবার এরকম হোল। অদৃষ্টলিপি ছাড়া আর কি।

আমি বললাম—চলো আমরা—

কিন্তু মাথা তখন ঘুরছে। কোনো সাংসারিক প্ল্যান আঁটবার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। ওই পর্য্যন্ত বলে চুপ করলাম। পান্না হেসে বললে—খুব হয়েচে, এখন নাইবে চলো।

—চলো। কোথায় ?

—কলতলায়।

—ওখানে বড্ড নোংরা। তা ছাড়া, এ বাড়িতে চারিদিকে দেখচি শুধু মেয়েছেলের ভিড়। ওদের মধ্যে বসে নাইবো কি করে ?

—ঘরে জল তুলে দিই—

—তার চেয়ে চলো কালীঘাটের গঙ্গায় দুজনে নেয়ে আসি

পান্নাও রাজী হোল। দুজনে নাইতে বেরুবো, এমন সময়ে সেই বুড়ী মাসী এসে হাজির হোল। কড়াসুরে

আমায় বললে—বলি ওগো ভালমা...র ছেলে, একটা কথা তোমায় শুধুই বাপু—

আমি ওর রকম সকম দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বললাম—বলুন।

—তুমি বাপু ওকে টুইয়ে কোথায় নিয়ে বের করচো?

—ও নাইতে যাচ্ছে আমার সঙ্গে।

—ও! আমার ভারী নবাবের নাতী রে। পান্না তোমার ঘরের বৌ নাকি যে, যা বলবে তাই করতে হবে তাকে? ওর কেউ নেই? অত দরদ যদি থাকে পান্নার ওপর, তবে মাসে ষাট টাকা করে দিয়ে ওকে বাঁধা রাখো। ওর গহনা দেও, সব ভার নাও—তবে ও তোমার সঙ্গে যেখানে খুশি যাবে। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর?

আমি চুপ করে রইলাম। পান্না সেখানে উপস্থিত ছিল না, সাবানের বাক্স আনতে ঘরের মধ্যে গিয়েছিল। বুড়ী ওর অনুপস্থিতির এ সুযোগটুকু ছাড়লে না। আবার বললে—তুমি এয়েচ ভালমানুষের ছেলে পান্নাকে পৌঁছে দিতে। মফঃস্বলের লোক। বেশ, যেমন এয়েচ, দুদিন থাকো, খাও মাখো, কলকাতার পাঁচটা জায়গা দেখে বেড়াও, বেড়িয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। পান্নাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া করবার দরকার কি তোমার? তুমি গেঁয়ো নোক, শহরের রীত্ কি, তুমি তা জানো না। তোমার ভালোর জন্যেই বলচি বাছা—

বুড়ীর সে কথা যদি তখন আমি শুনতাম!

যাক সে কথা।

পান্নাকে আর আমি পীড়াপীড়ি করিনি নাইতে যাবার

জন্যে। ওকে কিছু না বলে আমি নিজেই নাইতে গেলাম একা। ফিরে আসতে পান্না বললে—এ কি রকম হোল ?

—কেন ?

—একা নাইতে গেলে ?

—আমি গেঁয়ো লোক। কলকাতা দেখতে এসেচি, দেখে ফিরে যাই। দরকার কি আমার রাজকন্যের খোঁজে !

—আমি কি রাজকন্যে নাকি ?

—তারও বাড়া।

—কেন ?

—সে সব কথা দরকার নেই। আমি আজই বাড়ি চলে যাবো।

—ইশ্! মাইরি ? পায়ে মাথা কুটবো না ? কি হয়েচে বলো—সত্যি, বলবে ?

আমি বুড়ির কথা কিছু বলা উচিত বিবেচনা করলাম না। হয়তো তুমুল ঝগড়া আর অশান্তি হবে এ নিয়ে। না, এ বাড়িতে আমার থাকা সম্ভব হবে না আর। একদিনও না। নিজের মন তৈরি করে ফেললাম, কিন্তু পান্নাকে সে কথা কিছু বলিনি। বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার নাম করে বেরিয়ে সোজা শেয়ালদ'তে গিয়ে টিকিট কাটবো।

খাওয়ার সময় পান্না নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালে। আগের রাত্রে আমি নিজেই দোকান থেকে লুচি ও মিষ্টি কিনে এনে খেয়েছিলাম—আজ ও বললে—আমি নিজে মাংস রান্না করচি তোমার জন্যে, বলো খাবে ? এমন সুরে

অনুরোধ করলে, ওর কথা এড়াতে পারলাম না। বড় এক বাটি মাংস ও নিজের হাতে আমার পাতের কাছে বসিয়ে দিলে, সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াতে লাগলো বাড়ির মেয়েদের মত। কিন্তু একটা কাজ ও হঠাৎ করে বসলো, আমার মাংসের বাটি থেকে একটু মাংস তুলে নিয়ে মুখে দিয়ে তখন বলচে—খাবো একটু তোমার এ থেকে ?

তারপর হেসে বললে—দেখচি কেমন হয়েচে।

আমার সমস্ত শরীর যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো, এত কালের সংস্কার যাবে কোথায় ? আমি বললাম—ও এঁটো হাত যেন দিও না বাটিতে ? ছিঃ—

পান্না দুষ্টুমির হাসি হেসে হাত খানিকটা বাটির দিকে বাড়িয়ে বললে—দিলাম হাত, ঠিক দেবো—দিচ্চি কিন্তু—

পরে নিজেই হাত গুটিয়ে নিয়ে বললে—না, না, তাই কখনো করি ? হয়তো তোমার খাওয়া হবে না—খাও তুমি খাও—। আমি জানি কোনো মার্জ্জিতরুচি ভদ্রমহিলা অতিথিকে খাওয়াতে বসে তার সঙ্গে এমন ধরনের ব্যবহার করতো না—কিন্তু পান্না যে শ্রেণীর মেয়ে, তার কাছে এ ব্যবহার পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হইনি মোটেই। পান্না বললে—মাংস কেমন হয়েচে ?

—বেশ হয়েচে।

—আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে।

—কোথায় ?

—যেখানে তোমার খুসি—

পরে বাঁকা ভুরুর নিচে আড় চাউনি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললো—আমি তোমার, যেখানে নিয়ে যাবে—

সে চাউনি আমাকে কাণ্ডজ্ঞান ভুলিয়ে দিলে, আমি এঁটো হাতেই ওর পুষ্পপেলব হাতখানা চেপে ধরতে গেলাম, আর ঠিক সেই সময়েই সেই বুড়ি সেখানে এসে পড়লো! আমার দিকে কটমট চোখে চেয়ে দেখলে, কিছু বললে না মুখে। কি জানি কি বুঝলে।

আমি লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে ভাতের থালার দিকে চাইলাম। কোনো রকমে দু'চার দলা খেয়ে উঠে পড়ি তখুনি!

কাউকে কিছু না বলে সেই যে বেরিয়ে পড়লাম, একেবারে সোজা শেয়ালদা' ষ্টেশনে এসে গাড়ী চেপে বসে দেশে রওনা।

সুরবালা আমায় দেখে অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলে। তারপর বললে—কোথায় ছিলে?

—কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আসচি।

—তা আমিও ভেবেছি। সবাই তো ভেবে চিন্তে অস্থির, আমি ভাবলাম ঠিক কোনো দরকারি কাজ পড়েচে, কলকাতায় টলকাতায় হঠাৎ যেতে হয়েচে। একটা খবর দিয়েও তো যেতে হয়! এমন তো কখনো করো নি?

—এমন অবস্থাও তো এর আগে কক্ষনো হয়নি। সবাই ভাল আছে?

—তা আছে। নাও, তুমি গা হাত পা ধুয়ে নাও, চা করে নিয়ে আসি। খাওয়া হয়েচে?

একটু পরে সুরবালা চা করে নিয়ে এল। বললে—বাবাঃ

এমন কখনো করে? ভেবে চিন্তে অস্থির হতে হয়েচে। সনাতনবাবু তো হ'বেলা হাঁটাহাঁটি করচেন। নৌকার মাঝি ফিরে এসে বললে—বাবু, শেষ রাত্তিরে কোথায় চলে গেলেন হঠাৎ—আমাকে কিছু বলে তো যান নি—সনাতনদা আবার যাবেন বলছিলেন মঙ্গলগঞ্জে খোঁজ নিতে। যান নি বোধ হয়—

সনাতনদা ভাগিসে মঙ্গলগঞ্জে যায়নি। সেখানে গেলেই সব বলে দিতো গোবিন্দ দাঁ বা আবদুল হামিদ। এখনও ওরা অবিশ্যি জানে না। আমি বাড়ি চলে এসেছিলাম না কলকাতায় গিয়েছিলাম। সনাতনদা অনুসন্ধান করতে গেলেই ওরা বুঝতে পারতো আমি পান্নার সঙ্গেই চলে গিয়েছি।

একজন লোককে পাঠিয়ে দিলাম সনাতনদা'র বাড়িতে খবর দিতে যে আমি ফিরে এসেছি।

সুরবালার মুখ দেখে বুঝলাম ওর মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। ওর মন তো আমি জানি, সরলা শান্ত স্বভাবের মেয়ে। অতশত ও কিছু বোঝে না। ও আমাকে খাওয়াতে মাখাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

তবুও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ও যেন কি দেখলে।

আমি বললাম—কি দেখচো?

—তোমার শরীর ভাল আছে তো?

—কেন?

—তোমার মুখ যেন শুকিয়ে গিয়েচে—কেমন যেন দেখাচ্চে—

হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললাম—ও, এই!

সুরবালা উদ্বেগের সুরে বললে—না সত্যি। তোমার মুখে যেন—

—ও কিছু না। একটু ঘুমুই—

—একটু ওষুধ খাও না কিছু? তুমি তো বোঝ—

—কিছু না। মশারিটা ফেলে দিয়ে যাও, ঘুমুই একটু—

সকালে সনাতনদা এসে হাজির হোল। বললে—এ কি হে? তুমি হঠাৎ কোথাও কিছু নয়, কোথায় চলে গেলে? বৌমা কেঁদে কেটে অস্থির।

বললাম—কলকাতায় গিয়েছিলাম!

—কেন, হঠাৎ?

—বিশেষ কারণ ছিল।

—সে আমি বুঝতে পেরেছি। নইলে তোমার মত লোক হঠাৎ অমনি না বলা কওয়া কলকাতা চলে যাবে? তা কি কারণটা ছিল?

—সে একটা অন্য ব্যাপার।

—সনাতনদা আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। আমার মুস্কিল আমি মিথ্যে কথা বড় একটা বলিনে, বলতে মুখে বাধে —বিশেষ কাজে হয়তো বলতে হয় কিন্তু পারতপক্ষে না বলারই চেষ্টা করি। অন্য কথা পাড়লাম তাড়াতাড়ি। সনাতনদা দু'তিনবার চেষ্টা করলে কলকাতা যাবার কারণটি জানবার। আমি প্রতিবারই কথা চাপা দিলাম। সনাতনদা বললে— মঙ্গলগঞ্জে যাবে নাকি?

—যাবো বৈকি। রুগী রয়েচে।

—আমিও চলো যাই—

—তুমি যাবে ?

—চলো বেড়িয়ে আসি—

সর্ব্বনাশ। বলে কি সনাতনদা ? মঙ্গলগঞ্জে গেলেই ও সব জানতে পারবে হয়তো। ওর স্বভাবই একে ওকে জিজ্ঞেস করা। গোবিন্দ দাঁ সব বলে দেবে। কিন্তু আমার এখনও সন্দেহ হয় গোবিন্দ দাঁ বা মঙ্গলগঞ্জের কেউ এখন হয়তো জানে না আমি কোথায় গিয়েছিলম।

সনাতন বললে—কবে যাবে ?

—দেখি কালই যাবো হয়তো।

সনাতনদা চলে গেল। আমি তখনই সাইকেল চেপে মঙ্গলগঞ্জে যাবার জন্যে তৈরি হোলাম। আগে সেখানে গিয়ে আমায় জানতে হবে। নয়তো সনাতনদাকে হঠাৎ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

সুরবালাকে বলতেই সে ব্যস্তভাবে বললে—না গো না, এখন যেও না—

—আমার বিশেষ দরকার আছে। মঙ্গলগঞ্জে যেতেই হবে।

—খেয়ে যাও।

—না, এসে খাবো।

সাইকেলে যেতে তিন চার মাইল ঘুর হয়। রাস্তায় এই বর্ষাকালে জল কাদা, তবুও যেতেই হবে।

বেলা সাড়ে দশটার সময় মঙ্গলগঞ্জের ডি-স্পেনসারির দোর

খুলতেই চাকরটা এসে জুটলো। বললে—বাবু, পরশু এলেন না? আপনি গিয়েলেন কনে?

—কেন?

—আপনার সেই মাঝি নৌকো নিয়ে ফিরে গেল।

—তোর সে খোঁজে কি দরকার? যা নিজের কাজ দেখগে—

একটু পরে গোবিন্দ দা এল কার মুখে খবর পেয়ে। ব্যস্তভাবে বললে—ডাক্তার, ব্যাপার কি? কোথায় ছিলেন?

—কেন?

—সেদিন গেলেন কোথায়? মাঝি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। শেষে নৌকো নিয়ে গেল। এখন আসা হচ্ছে কোথা থেকে?

—বাড়ি থেকেই আসচি। সেদিন একটু বিশেষ দরকারে অন্যত্র গিয়েছিলাম।

—তবুও ভাল। আমরা তো ভেবে চিন্তে অস্থির।

গোবিন্দ দা সন্দেহ করেনি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা গেল। গোবিন্দই সব চেয়ে ধূর্ত্ত ব্যক্তি, সন্দেহ যদি করতে পারে, তবে ওই করতে পারতো। ও যখন সন্দেহ করেনি, তখন আর কারো কাছ থেকে কোনো ভয় নেই। আমি ভয়ানক কাজে ব্যস্ত আছি দেখাবার জন্যে আলমারি খুলে এ শিশি ও শিশি নাড়তে লাগলাম। গোবিন্দ দা একটু পরে চলে গেল।

ও যেমন চলে গেল আমি একা বসে রইলুম ডিস্‌পেনসারি ঘরে। অমনি মনে হোল—পান্না ঠিক ওই দোরটি ধরে সেদিন দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে হোল একা এখানে এসে থাকি

ভুল করেছি। পান্নার অদৃশ্য উপস্থিতিতে এ ঘরের বাতাস ভরে আছে—হঠাৎ তার সেই অদ্ভুত ধরনের দুষ্টুমির হাসিটা স্পষ্ট ফুটে উঠলো আমার চোখের সামনে। মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সে কি সাধারণ চঞ্চলতা ?

অমন যে আবার হয় তা জানতাম না।

পান্না এখানে ছিল সে গেল কোথায় ? সেই পান্না, অদ্ভুত ভঙ্গি, অদ্ভুত দুষ্টুমির হাসি নিয়ে ? তাকে আমার এখুনি দরকার। না পেলে চলবে না, আমার জীবনে অনেকখানি জায়গা যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সে শূন্যতা যাকে দিয়ে পুরতে পারে সে এখানে নেই—কতদূর চলে গিয়েছে। আর কি তাকে পাবো না ?

পান্নার অদৃশ্য আবির্ভাব আমাকে মাতাল করে তুলেচে। ওই চেয়ারটাতে সেদিন সে বসেছিল। এখান থেকে ডিস্‌পেনসারি উঠিয়ে দিতে হবে।

পকেট খুঁজে দেখি মোটে দুটে টাকা। বিষ্ণু সাধুখাঁর দোকান পাশেই। তাকে ডাকিয়ে বললাম—দশটা টাকা দিতে পারবে ?

—ডাক্তারবাবু, প্রাতঃপ্রণাম। কোথায় ছিলেন ?

—বাড়ি থেকে আসচি। টাকা ক'টা দাও তো ?

—নিয়ে যান।

তার দোকানের ছোকরা চাকর-মাধার এসে একখানা নোট আমার হাতে দিয়ে গেল। আমি সাইকেলখানা ডিস্‌পেনসারির

মধ্যে চাবি দিয়ে রেখে ষ্টেশনে চলে এলাম। আড়াই ক্রোশ রাস্তা হাটতে হোল সেজন্যে।

পান্না আমায় দেখে অবাক। সে নিজের ঘরের সামনে চুপ করে একখানা চেয়ারে বসে আছে—কিন্তু সাজগোজ তেমন নেই। মাথার চুলও বাঁধা নয়।

আমি হেসে বললাম—ও পান্না—

—তুমি!

—কেন! ভূত দেখলে নাকি?

—তুমি কেমন করে এলে তাই ভাবচি?

—কেন আসবো না?

—সত্যি তুমি আমার এখানে এসেচ?

পান্না যে আমাকে দেখে খুব খুসি হয়েচে সেটা তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারলাম। ওর এ আনন্দ কৃত্রিম নয়। পান্না আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে খাটের ওপর বসিয়ে একখানা হাতপাখা এনে বাতাস করতে লাগলো। ওর এ যত্ন ও আগ্রহ যে নিছক ব্যবসাদারি নয় এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দিয়েচেন। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম বেশ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে। সে মুখে ব্যবসাদারির খোঁজও নেই। আমি বিদেশ থেকে ফিরলে সুরবালার মুখ এমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিন্তু সুরবালার এ লাবণ্য-ভরা চঞ্চলতা, এত প্রাণের প্রাচুর্য্য নেই। এমন সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করে সে হাঁটতে পারে না, এমন বিদ্যুতের মত কটাক্ষ তার নেই, এমন দুষ্টুমির হাসি তার মুখে ফোটে না।

পান্না বললে—দেশে গিয়েছিলে ?

—হাঁ।

—তবে এলে যে আবার ?

—তোমায় দেখতে।

—সত্যি বলো না ?

—বিশ্বাস কর। আজ মঙ্গলগঞ্জ থেকে সোজা তোমার এখানে আসচি।

—কেন ? বলো, বলতেই হবে।

—বলবো না।

—বলতেই হবে, লক্ষ্মীটি।

—তোমার জন্যে মন কেমন করে উঠলো। তুমি সেদিন দোর ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সে জায়গাটা দেখেই মন বড় অস্থির হোল, তাই ছুটে এলাম।

—খুব ভাল করেচ। জানো ? আমি মরে যাচ্ছিলাম তোমার সাথে দেখা করবার জন্যে। তুমি যে দিনটি চলে গেলে, সেদিন থেকে—

—কেন মিথ্যে কথাগুলো বলে ? ছিঃ।

পান্না খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কি ? আমি তোমার পায়ে মাথা কুটে মরবো দেখো তবে—আমি মিথ্যে কথা বলচি ?

আমি সুখের সমুদ্রে ডুবে গেলাম। কি আনন্দ ! সে আনন্দের কথা মুখে বলে বুঝানো যাবে না। এই সুন্দরী লাবণ্যময়ী চঞ্চলা ষোড়শী আমার মত মধ্যবয়স্ক লোককে

ভালবাসে! এ আমার কত বড় গর্ব্ব, আনন্দের কথা, ইচ্ছে হয় এখুনি ছুটে বাহিরে চলে গিয়ে দু'পারের দুই পথের প্রত্যেক লোককে ধরে ধরে চীৎকার করে বলি—ওগো শোনো—পান্না আমাকে ভালবাসে, আমার জন্যে সে ভাবে!…ভালবাসা জীবনে কখনো আস্বাদও করিনি। জানিনে, ও জিনিসের রূপ কি। এবার যেন ভালবাসা কাকে বলে বুঝেচি। ভালবাসা পেতে হয় এরকম সুন্দরী ষোড়শীর কাছ থেকে, যার মুখের হাসিতে, চোখের কোণের বিদ্যুৎ কটাক্ষে ত্রিভুবন জয় হয়ে যায়!

কেন আমি আজ তেরো বছর হলো বিয়ে করেছি। সুরবালা কখনো ষোড়শী ছিল না? সে আমাকে ভালবাসে না? মেয়েদের ভালবাসা কখনো কি পাইনি? সে কথার জবাব কি দেবো আমি নিজেই খুঁজে পাই না। কে বলে সুরবালা আমায় ভালবাসে না? কিন্তু সে এ জিনিস নয়। তাতে নেশা লাগে না মনে। সে জিনিসটা বড্ড শান্ত, স্থির, সংযত, তার মধ্যে নতুন আশা করবার কিছু নেই—নতুন করে দেখবার কিছু নেই—ও কি বলবে আমি তা জানি, বলতেই তাকে হবে, সে আমার বাড়ি থাকে, খায়, পরে। ভালো মিষ্টি কথা তাকে বলতে হবে। তার মিষ্টি কথা আমার দেহে মনে অপ্রত্যাশিতের পুলক জাগায় না। সুরবালা কোনোকালেই এরকম সজীব, প্রাণচঞ্চলা সুন্দরী, ষোড়শী কিশোরী ছিল না—তার চোখে বিদ্যুৎ ছিল না।

পান্নার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললাম—বোসো, ছেলেমানুষী কোরো না—

—তা হলে বললে কেন অমন কথা ?

—ঠাট্টা করছিলাম। তোমার মুখে কথাটা আবার শুনতে চাচ্ছিলাম—

—চা করি ?

—তোমার ইচ্ছে—

—কি খাবে বলো ?

—আমি কি জানি ?

—আচ্ছা বোসো। লক্ষ্মী হয়ে বোসো, ভাল হয়ে বোসো, পা তুলে বোসো, পা ধুয়ে জল দিয়ে মুছিয়ে দেবো, সাত রাজার ধন এক মাণিক বোসো ?

—যাও—

আমি বসে একটা সিগারেট ধরিয়েচি, এমন সময় পান্নার মাসী সেই বুড়ি এসে আমার দিকে কটমট করে চাইলে। আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। যেন প্রাইভেট টিউটর ছাত্রকে দিয়ে বাজারের দোকানে সিগারেট কিনতে পাঠিয়ে ছাত্রের অভিভাবকের সামনে পড়ে গিয়েচে।

বুড়ি আরও কাছে এসে বললে—সেই তুমি না ? সেদিন চলে গেলে ?

গলা ভিজিয়ে বলি—হাঁ।

—তা আবার এলে আজ ?

—একটু কাজ আছে—

—কি কাজ ?

—কলকাতায় কাজ। এই চিৎবাজারের—

—তোমার দোকান টোকান আছে নাকি ?

—হাঁ, ওষুধের দোকান—

—ওষুধ কিনতে এসেছ তা এখানে কেন ?

—পান্নার সঙ্গে দেখা করতে।

—কোথায় গেল সে ছুঁড়ি ? দেখা হয়েচে ?

—হ্যাঁ।

—তোমরা সবাই মিলে ও ছুঁড়ির পেছনে পেছনে অমন ঘুরচো কেন বলো তো ? তোমাদের পাড়াগাঁ অঞ্চলে মেয়েকে পাঠালেই এই কাণ্ড গা ? জ্বলে পুড়ে মনু বাপু তোমাদের জ্বালায়। আবার তুমি এসে জুটলে কি আক্কেলে ?

আমি এ কথার কি জবাব দেবো ভাবচি, এমন সময় বুড়ি বললে—তোমাকে সেবার ভাল কথা বনু বাছা তা তোমার কানে গেল না। তুমি বাপু কি রকম ভদ্দর নোক ? বয়েস দেখে মনে হয় নিতান্ত তুমি কচি খোকাটি তো নও—এখানে এলেই পয়সা খরচ করতে হয় বলি জানো সে কথা ? বলি এনেচ কত টাকা সঙ্গে করে ? ফতুর হয়ে যাবে বলে দিচ্চি। সহুরে বাবুদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে টাকা খরচ করতে গিয়ে একেবারে ফতুর হয়ে যাবে, এখনো ভালোয় ভালোয় বাড়ি চলে যাও—

—যাবোই তো। থাকতে আসিনি।

—সে কথা ভালো। তবে এত ঘন ঘন এখানে নাই বা এলে বাপু ? ও ছুঁড়িকেও তো বাইরে যেতে হবে, তোমার সঙ্গে জোড় পায়রা হয়ে বসে থাকলে তো ওর চলবে না।

এমন সময় পান্না রেকাব ও চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকে বললে—কি মাসী কি বলচো ওঁকে? যাও এখন ঘর থেকে—

বৃদ্ধা আমার দিক থেকে ওর দিকে ফিরে বললে—ভাখ পান্নু, বাড়াবাড়ি কোন বিষয়ে ভালো না। দু'জনকেই হিত কথা শোনাচ্চি বাপু,—কষ্ট পেতে আমার কি, তোরা দুজনেই পাবি—

পান্না ব্যঙ্গের সুরে বললে—তুমি এখন যাবে একটু এ ঘর থেকে? ওঁকে এখন বোকো না। সমস্ত রাত ওঁর খাওয়া হয়নি জানো?

বুড়ি বললে—বেশ তো, আমি কি বল্লু খেয়ো না, মেখো না, খাও দাও, তারপর সরে পড়—

—তুমি এবার সরে পড় মাসী, দেখি—

বুড়ি গজ গজ করতে করতে চলে গেল। পান্না আমার সামনে এসে রেকাব নামাল, তাতে একটুখানি হালুয়া ছাড়া অন্য কিছু নেই। এই অবস্থায় সুরবালা কত কি খাওয়াতো। পান্নার মত মেয়েরা সেদিক থেকে বড্ড আনাড়ি, খাওয়াতে জানে না। আমার খাওয়ার সময়ে পান্না নিজেই বললে—বুড়ি বড় খিটখিট করে না? চলো আজ দু'জনে কালীঘাট ঘুরে আসি, কি কোথাও দেখে আসি—

আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম যেন। ব্যগ্রভাবে বলি—যাবে তুমি? কখন যাবে? উনি বকবেন না? যেতে দেবেন তোমাকে?

পান্না হেসে লুটিয়ে পড়ে বললে—আঁহা, কথার কি ছিরি। ওই জন্যেই তো—হি-হিঁ-হি—যাবে তুমি? কখন যাবে? হি-হি-হি—

এই তো অনুপমা পান্না, অদ্বিতীয়া পান্না, হাস্যলাস্যময়ী আসল পান্না, হাজারো মেয়ের ভিড়ের মধ্যে থেকে যাকে বেছে নেওয়া যায়। এমন একটি মেয়ের চোখে তো পড়িনি কোনদিন। মন খুশিতে ভরে উঠলো, যার দেখা পেয়েছি, যে আমাকে ভালবেসেচে পথে ঘাটে দেখা মেলে না তার।

না। পান্না যে আমাকে ভালোবাসে, এ সম্বন্ধে আমি তত নিশ্চিত ছিলাম না। ওর ভালবাসা আমাকে জয় করে নিতে হবে এই আমার বড় উদ্দেশ্য জীবনের। এখন যেটুকু ভালবাসে, ওটা সাময়িক মোহ হয় তো। ওটা কেটে যাবার আগে আমি ওকে এমন ভালবাসাবো যে আর সমস্ত কিছু বিস্বাদ হয়ে যাবে ওর কাছে। এই আমার সাধনা, এই সাধনায় আমায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। আমাকে পাগল করে দিতে হবে। আমার জন্যে পাগল করে দিতে হবে।

পান্নাকে দেখবার জন্যে ওদের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করবার সাহস আমার হোল না। ওর মাসীর মুখের দিকে চাইলে আমার সাহস চলে যেতো।

একদিন পান্নাকে বললাম—চলো আমার সঙ্গে।

পান্না হেসে বললে—কোথায় যাবো?

—যে রাজ্যে মাসী পিসীরা নেই।

পান্না খিলখিল করে হেসে উঠে বললে—কোথায়? নদীর ওপারে?

তারপর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগলো—বলি? উত্তরপাড়া? কোন্নগর? হুগলী?

—না।

—তবে?

—আমি যেখানে ভাল বুঝবো। যাবে?

—নিশ্চয়ই।

—এখুনি?

—এখুনি।

পান্নাকে আমি খুব ভালভাবে চিনিনে বটে কিন্তু আমি মানুষ চিনি। ওর চোখের দিকে চেয়ে বুঝলাম পান্না, মিথ্যে কথা বলচে না। ও আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছে, যেখানে ওকে নিয়ে যাবো। শুধু এইটুকু জানা বোধ হয় আমার দরকার ছিল। যেই বুঝলাম ও আমার সঙ্গে যতদূর নিয়ে যাবো যেতে পারে, তখন আমি একটা অদ্ভুত আনন্দ মনের মধ্যে অনুভব করলাম। সে আনন্দ একটা নেশার মত আমাকে পেয়ে বসলো। সে নেশা আমাকে ঘরে থাকতে দিলে না—সোজা এসে বড় রাস্তার ওপর পড়লাম। সেখানে থেকে ট্রামে গড়ের মাঠে এসে একটা গাছের তলায় বেঞ্চিতে নির্জ্জনে বসলাম।

হাতে কত টাকা আছে? কুড়ি পঁচিশের বেশী নয়। এই টাকা নিয়ে কতদূর যেতে পারি দু'জনে? কাশী হয় তো!

ফিরতে পারবো না। ফিরবার দরকারও নেই। আর আসবো না। সব ভুলে যাবো ঘর বাড়ি, সুরবালা, ছেলেমেয়ে। ওসবে আমার কোন তৃপ্তি নেই। সত্যিকার আনন্দ কখনো পাইনি। এবার নতুন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করবো পান্নাকে নিয়ে।

আজ রাত্রেই যাবো।

মাতালের মত টলতে টলতে বড় রাস্তায় এসে ট্রাম ধরলাম। এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো—কি রে, শোন, শোন—

ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম। পেছন দিকে চেয়ে দেখি আমার মেডিকেল কলেজের সহপাঠী করালী। অনেক দিন দেখা হয় নি, দেখে আনন্দ হোল। ওর সঙ্গে পুরানো কথাবার্ত্তায় অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। করালী ডায়মণ্ডহারবারের কাছে কি একটা গ্রামে প্র্যাকটিস্ করচে। আমায় বললে, চল একটু চা খাই কোনো দোকানে।

—বেশ, চলো।

আমার চা খাবার বিশেষ কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে আবার ফিরে আসা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় আমি আদৌ নেই। করালী গ্রাম্য প্র্যাক্টিসের অনেক গল্প করলে। দু'একটা শক্ত কেসের কথা বললে। আমি একমনে বসে শুনছিলাম। করালীকে

বললাম—অমনি একটা নিরিবিলি গ্রামের ঠিকানা আমায় দিতে পারিস ?

—কেন রে ?

—আমি প্র্যাক্‌টিস করবো তোর মত।

—কেন তুই তো গ্রামেই বসেছিলি—তাই না ? চাকরি নিয়েচিস নাকি ?

—জায়গাটা বদলাবো।

—বদলাবি বটে কিন্তু একটা কথা বলি। ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নেই গ্রামে—বেশি পয়সা হবে না।

—যা হয়।

—আমি দেখবো খোঁজ করে। তোর ঠিকানাটা দে আমাকে।

—তোর ঠিকানাটা দে, আমি বরং তোকে আগে চিঠি দেবো।

করালী বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আমি পান্নার বাড়িতেই চললাম সোজা। ওর ঘরের বাইরে একটা কাঠের বেঞ্চি আছে, বেঞ্চিটার ঠিক ওপরেই দেয়ালে একটা পুরানো সস্তা খেলো ক্লকঘড়ি। ঘরের মধ্যে ঢোকবার সাহস আমার কুলালো না, ঘড়ির নিচে বেঞ্চিখানাতে বসে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে পান্নাই প্রথম এল ওদিকের একটা ঘর থেকে।

আমায় দেখে অবাক হয়ে বললে—এ কি !

বললাম—চুপ, চুপ।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—কোথায় ?

পান্না হেসে বললে—কে ? মাসী ? হরিসংকীর্ত্তন না কথকতা কি হচ্চে গলির মোড়ে, তাই শুনতে গিয়েচে! বুড়ির দল সবাই গিয়েচে। তাই মলিনাদের ঘরে একটু মজা করে চা আর সাড়ে বত্রিশ ভাজার মজলিস করছিলাম। আনবো আপনার জন্যে ? দাঁড়ান—

আমি ব্যস্তভাবে বললাম—শোনো, শোনো, থাক ওসব। কথা আছে তোমার সঙ্গে—

পান্না যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে আবার যেতে যেতে বললে—বসুন ঠাণ্ডা হয়ে। বুড়িরা নিশ্চিন্দি হয়ে বেরিয়েচে—রাত ন'টার এদিকে ফিরবে না। চা আর ভাজা খেয়ে কথা হবে এখন বসে বসে।

—বেশ আমি এত রাত্রে যাব কোথায় ?

—এখানে থাকবেন।

—সে সাহস আমার নেই।

পান্না ধমক দিয়ে বললে—আপনি না পুরুষমানুষ ? ভয় কিসের ? আমি আছি। সে ব্যবস্থা করবো।

—তুমি থাকলে তবু ভরসা পাই।

—বসুন—আসচি—

একটু পরেই পান্না চা আর বাদাম ভাজা নিয়ে ফিরলো। বললে—চলুন ঘরে।

—না, আমি ঘরে যাবো না। এখানেই বলো।

পান্না হঠাৎ এসে খপ্ করে আমার হাত ধরে বললে—তা হবে না আসুন।

আমি কৃত্রিম রাগের সুরে বললাম—তুমি আমার হাত ধরলে কেন ?

—বেশ করেচি, যাও।

—জান ওসব আমি পছন্দ করিনে।

—আমি ভয়ও করিনে।

দু'জনে খুব হাসলাম। বললাম—পান্না তুমি কি আমায় ভালোবাসো ? সত্যি জবাব দাও।

পান্না ঘাড় দুলিয়ে বললে—না—

—না, হাসি ঠাট্টা রাখো, সত্যি বলো।

—কখনই না।

—বেশ, আমি তবে এই রাত্তিরে চলে যাবো।

—সত্যি ?

—যদি ভালো না বাসো, তবে আর মিথ্যে কেন খয়ে বন্ধন—

পান্না খিলখিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। ততক্ষণ সে আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেচে !

আমি কিন্তু মন ঠিক করে রেখেচি। ফাঁকা কথায় ভুলবার পাত্র নই আমি। কাল সকালে পান্না আমার সঙ্গে যেতে পারবে কিনা ? যেখানে আমি নিয়ে যাবো। সে বিচারের

ভার আমার উপর ছেড়ে দিতে পারবে কি ও ? আমি জানতে চাই এখুনি।

পান্না সহজভাবে বললে—নাও ওগো গুরুঠাকুর, কাল সকালে যখন খুসি তুমি কৃপা করে আমায় উদ্ধার কোরো—এখন চা'টুকু আর ভাজা ক'টা ভাল মুখে খেয়ে নাও তো দেখি ?

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেল। আমি বললাম—এখন ?

পান্না হেসে বললে—কি এখন

—এখন কি করা যাবে ?

—এখানে থাকতে হবে রাত্রে, আবার কি হবে ?

আমারও তাই ইচ্ছে। পান্নাকে ছেড়ে যেতে এতটুকু ইচ্ছে নেই আমার। ওর মুখের সৌন্দর্য্য আমাকে এত মুগ্ধ করেচে যে ওর মুখের দিকে সর্ব্বদা চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ না দেখলে মনে হয় পান্নার মুখ আমার মনে নেই, আদৌ মনে নেই। আর একবার কখন্ দেখা হবে ? পান্নার মুখ ভুলে গেলাম ? ওকে না দেখে থাকতে পারিনে। ওর মুখের নেশা মদের নেশার মতই তীব্র আমার কাছে। বুঝচি মোহ আনচে। সর্ব্বনাশ করচে আমার, অমানুষ করে দিচ্চে আমাকে। কিন্তু ছাড়বার সাধ্য নেই আমার। ছাড়বোই যদি, তবে আর মোহ বলেচে কেন ?

মনে মনে ভাবলুম, পান্নার মাসী যে খাণ্ডার, এখানে আমাকে রাত্রে দেখতে পেলে যা খিট্‌খিট্ করবে

পান্নাকে বললাম, কিন্তু তোমার সেই মাসী ? যিনি জন্মাচ্ছেই তাঁর মা জিবে মধু দিয়েছিলেন ?

পান্না খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। আমার মুখের দিকে হাসি-উপছে-পড়া ডাগর চোখে চেয়ে বললে, সে কি? আবার বলুন ত কি বল্লেন?

—তোমার সেই খাণ্ডার মাসী—

—হ্যাঁ, তারপর?

—যিনি জন্মাতেই তাঁর মা জিবে মধু দিয়েছিলেন।

—ওমা! কি কথার বাঁধুনি!

পান্না হেসে আবার গড়িয়ে পড়লো। কি সুন্দর, লাবণ্য-ময়ী দেখাচ্ছিল ওকে। হাত দু'টি নাড়ার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গি ওর। এ আমি ওর সঙ্গে আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি। আমার আরও ভাল লাগলো ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে। আমি ঠিক বলতে পারি সুরবালা বুঝতে পারতো না আমার কথার শ্লেষটুকু, বুঝতে পারলেও তার রস গ্রহণের ক্ষমতা এত নয়, সে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারতো না। পান্নাকে নতুন ভাবে দেখতে পেলুম সেদিন। আমি ভোঁতা মেয়ে ভাল-বাসিনে, ভালবাসি সেই মেয়েকে মনে মনে, ক্ষুরের মত ধার বুদ্ধির, কথা পড়বা মাত্র যে ধরতে পারে।

পান্না আমার কথা শুনে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো, ওর চোখের চাউনির ভাষা গেল বদলে। মেয়েদের এ অদ্ভুত খেলা দু'মিনিটের মধ্যে। তবে সব মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয় এ খেলা তাও জানি। সুরবালাদের মত দেবীর দল পারে না।

পান্নাকে বললাম—খাবো কি?

—কেন আমাদের রান্না খাবেন না ?

—না।

—তবে ?

—হোটেল থেকে খেয়ে আসবো এখন।

সে রাত্রে মাসী আমার দিকেও এলো না। কেন কি জানি। হয়তো পান্না আর আমি যখন গল্প করচি, ওর মাসী বাইরে এসে আমাদের কথা শুনতে পেয়ে বললে—ওমা, ই কি অনাছিষ্টি কাণ্ড! এখনো তোমাদের চোখে ঘুম এলো না ? রাত দুটো বেজেচে যে! পান্না চোখ টিপে আমায় চুপ ক'রে থাকতে বললে। দিব্যি গদি পাতা ধপধপে বিছানা, পান্না ওদিকে আমি এদিকে বালিস ঠেস দিয়ে বসে গল্প করছি। আমি ওকে যেন আজ নতুন দেখচি। একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারচিনে। কত প্রশ্ন, কত আলাপ পরস্পরে।

এমনি ভাবেই ভোর হয়ে গেল।

পান্না উঠে বললে—ফুলশয্যের বাসর শেষ হোল। তুমি চা খাবে তো ? মুখ ধুয়ে নাও—আমি চা করি।

—করো। আজ মনে আছে ?

—হ্যাঁ মনে আছে।

—কি বলো তো ?

—আজ তুমি আমায় নিয়ে যাবে।

—চা খেয়ে আমি একটু বেরুবো। তুমি তৈরি হয়ে থাকবে।

—বেশ।

—মাসীকে কিছু বলো না যেন যাওয়ার কথা। বাইরে দেখে এসো তো কেউ নেই, না আছে ?

পান্না মুখ টিপে হেসে বললে—সে আগেই আমি দেখেচি। এখনো কেউ উঠে নি। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো। চা খেয়ে আমি বাড়ির বার হয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসলাম। সারারাত ঘুম হয়নি, ঘুমে চোখ ঢুলে পড়েচে, কিন্তু একটা অদ্ভুত আনন্দে মন পরিপূর্ণ। করালী ঠিকানা দিয়েচে, ওকে একটা চিঠি লিখি। ওর দেশেই গিয়ে একটা বাসা নিয়ে প্র্যাক্‌টিস্ করবো।

আপততঃ কলকাতায় একটা ছোটখাটো বাসা দেখে আসা দরকার।

পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। যখন জেগে উঠলাম তখন বেলা সাড়ে ন'টা। একটা নাপিতকে ডেকে দাড়ি কামিয়ে নিলাম। চায়ের দোকানে আর এক পেয়ালা চা খেলাম। এইবার অবসাদ একটু কেটেচে। তারপর বাসা খুঁজতে বেরুই।

কলকাতায় আমায় কেউ চেনে না। ডাক্তারি পড়বার সময়ে যে মেসে থাকতাম, সেটা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে। সে মেসে আমাদের সময়কার এখন কেউ নেই—যে যার পাশ করে বেরিয়ে গিয়েচে আট দশ বছর আগে। তাহোলেও এই অঞ্চলের অনেক মুদী, নাপিত, চায়ের দোকানী আমায় চেনে হয়তো। ও অঞ্চলেও গেলাম না বাসা খুঁজতে। এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে আমাকে কেউ চেনে না।

কলকাতা সহর জনসমুদ্র বিশেষ, এখানে লুকিয়ে থাকলে কার সাধ্য খুঁজে বার করে? কে কাকে চেনে এখানে? অজ্ঞাত বাস করতে হোলে এমন স্থান আর নেই।

বাসা ঠিক হয়ে গেল লেবুতলা এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে বাসা আপাততঃ থাকবার জন্যে, ডাক্তারি এখান থেকে চলবে না, বড় রাস্তার ধারে তার জন্যে ঘর নিতে হবে বা একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসে কোনো একটা ডিস্‌পেনসারিতে বসবার চেষ্টা করতে হবে। বাড়িটা ভালো, ছোট হোলেও অন্য কোনো ভাড়াটে নেই, এই একটা মস্ত সুবিধে। এই রকম বাড়িই আমি চেয়েছিলাম। ওপরে দুটি ঘর, দুটিই বেডরুম হিসেবে ব্যবহার করা যায়, আলো হাওয়া মন্দ নয়।

বাড়িওয়ালা একজন স্বর্ণকার, এই বাড়ি থেকে কিছুদূরে কেরাণীবাগান লেনের মোড়ে তার সোনারূপার দোকান।

বাড়ি আমার দেখা হয়ে গেলে সে আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি কবে আসবো। আমি জানালুম আজই আসচি। চাবিটা কোথায় পাওয়া যাবে? সে ওর সোনারূপোর দোকান থেকে চাবিটা নিয়ে আসতে বললে।

এই বাড়িতে পান্না আর আমি নিভৃতে দু'জন থাকবো? পান্নাকে এত নিকটে, এত নির্জনে পাবো? ওকে নিয়ে এক বাসায় থাকতে পাবো? এত সৌভাগ্য কি বিশ্বাস করা যায়?

আনন্দে কিসের একটা ঢেউ আমার গলা পর্য্যন্ত উঠে আসতে লাগলো। আজই দিনের কোনো এক সময়ে পান্না

ও আমি এই ঘরে সংসার পেতে বাস করবো। এই ক্ষুদ্র দোতলা বাড়িটা—বাইরে থেকে যেটা দেখলে ঘোর অভক্তি হয়—সে সৌভাগ্যবহন করবে এই বাড়িটাই।

না, হয়তো কিছুই হবে না। পান্না আসবে না, পান্নার ম্যাসী পথ আটকাবে—ওকে আসতেই বাধা দেবে।

বাড়িওয়ালা আমার দেরি দেখে নিচে থেকে ডাকাডাকি করতে লাগলো। সে কি জানবে আমার মনের ভাব?

বাড়ি দেখে যখন বেরুলাম তখন বেলা একটা। খিদে পেয়েচে খুবই, কিন্তু আনন্দে মন পরিপূর্ণ, খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই।

বৌবাজারের মোড়ের একটা শিখ-হোটেল থেকে দু'খানা মোটা রুটি আর কলাইয়ের ডাল, বড় এক গ্লাস চা পান করি। চা জিনিসটা আমার সর্ব্বদাই চাই। অন্ন আহার না করলেও আমার কোনো কষ্ট হয় না, যদি চা পাই। ঠিক করলাম বাসাতে পান্নাকে এনেই আজই ওবেলা সর্ব্বাগ্রে আমার চায়ের সরঞ্জাম কিনে আনতে হবে। পান্না চা করতে জানে না ভালো, ওকে শিখিয়ে নিতে হবে চা করতে।

বেলা তিনটের পর পান্নাদের বাসাতে গিয়ে পৌঁছুলাম। পান্না অঘোরে ঘুমুচ্চে, কাল রাত্রি জাগরণের ফলে। পান্নার মাসীও ঘুমুচ্চে ভিন্ন ঘরে। পান্নাকে আমি ঘুম থেকে উঠিয়ে বললাম—সব তৈরী। বাসা দেখে এসেচি। কখন যাবে?

পান্না ঘুমজড়িত চোখে বললে—কোথায়?

—বেশ ! মনে নেই ? উঠে চোখে জল দাও।

—খেয়েচ ?

—না খেয়ে এসেচি ?

—আমি তোমার জন্যে লুচি ভেজে রেখেচি কিন্তু। আমাদের এখানে লুচি খেতে দোষ কি ?

—দোষের কথা নয়। তুমি চলো আমার সঙ্গে। সেখানে তুমি ভাত রেঁধে দিলেও খাবো।

—ঈশ্‌ ! মাইরি ! আমার কি ভাগ্যি !

—আমি গাড়ী নিয়ে আসি ?

—বোসো। চোখে জল দিয়ে আসি—

—তোমার মাসী ঘুমুচ্চে—এই সবচেয়ে ভালো সময়।

—বোসো। আসচি।

একটু পরে পান্না সত্যিই সেজেগুজে এল।

বললে—কোনো জিনিস নেই আমার, একটা পেটরা আছে কেবল। সেটা নিলুম আর এই কাপড়ের বোঁচকাটা।

আমি বললাম—চলো ওই নিয়ে। বাসে উঠবো আর দেরি করো না।

—দেওয়ালে দু'খানা পিক্‌চার আছে আমার নিজের পয়সায় কেনা, খুলে নিই—

পান্না ঠকাঠক শব্দ করে পেরেক তুলতে লাগলো দেখে আমার ভয় হোল। বললাম—আঃ, কি করো ? ওসব থাকগে। তোমার মাসী জেগে কুরুক্ষেত্র বাধাবে এখুনি।

পান্না হেসে বললে—সে পথ বন্ধ। আমি বলেই রেখেছি মুজরো করতে যেতে হবে আমাকে আজ। নীলি সঙ্গে যাবে। নীলি সেই মেয়েটি গো, আমার সঙ্গে যে গিয়েছিল মঙ্গলগঞ্জ।

একটু পরে আমরা দু'জনে রাস্তায় বার হই।

নেবুতলার বাসার সামনে রিকসা দাঁড় করিয়ে কেরাণীবাগান লেনের স্বর্ণকারের দোকানে চাবি আনতে গেলাম। বাড়িওয়ালা একহাল হেসে বললে—এসেচেন?—কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—চাবি নিয়ে আসিনে। দাঁড়ান একটু।

—আমি আমার স্ত্রীকে যে রিক্সাতে বসিয়ে রেখে এসেছি। ওই বাড়ির সামনে।

—আপনি মাঠাকরুণের কাছে চলে যান। আমি চাবি নিয়ে যাচ্ছি—

পান্না নাকি মাঠাকরুণ। মনে মনে হাসতে হাসতে এলাম।

আমার ইচ্ছে নয় যে বাড়িওয়ালা পান্নাকে দেখে। পান্নার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হঠাৎ মনে পড়লো। পান্নাকে বললাম—তাড়াতাড়ি ঘোমটা দাও। বাড়িওয়ালা আসচে।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠেই পান্না হঠাৎ চুপ করে ঘোমটা টেনে দিল। অভিনয় করতে দেখলুম ও বেশ পটু। যতক্ষণ বাড়িওয়ালা আমাদের সঙ্গে রইল বা ওপরে নিচের ঘরদোর

দেখাতে লাগলো, ততক্ষণ পান্না এমন হাবভাব দেখাতে লাগলো যেন সত্যিই ও নিতান্ত লজ্জাশীলা একটি গ্রাম্যবধূ।

বাড়িওয়ালা বললে—একটা অসুবিধা দেখচি যে—

—কি ?

—আপনি আপিসে বেরিয়ে যাবেন। মা ঠাকরুণ একা থাকবেন—

—তা একরকম হয়ে যাবে।

—আমার মেয়ে আছে, না হয় সে মাঝে মাঝে এসে থাকবে।

—তা হবে।

বাড়িওয়ালা তো চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পান্না ঘোমটা খুলে বললে—বাবাঃ, এমন বিপদেও —দম বন্ধ হয়ে মরেছিলুম আর একটু হোলে আর কি।

তারপর বাসা তো করলে দিব্যিটি। কিন্তু এত বড় বাড়ি নিলে কেন ? একটা ঘর হোলে আমাদের চলে যেতো। এত বড় বাড়ি সাজাবে কি দিয়ে ? না আছে একটা মাদুর বসবার, না একখানা কড়া, না একটা জল রাখবার বালতি।

—সব হবে ক্রমে ক্রমে।

—না হোলে আমার কি ? আমি মেজেতেই শুতে পারি।

একটি মাত্র পেঁটরা সঙ্গে এসেচে। তার মধ্যে সম্ভবতঃ পান্নার কাপড় চোপড়। পেতে বসবার পর্য্যন্ত একটা কিছু নেই। তাও ভাগ্যে বাড়িওয়ালা ঘরগুলো ধুয়ে রেখেছিল, নতুন ঘর ঝাঁট দেবার ঝাঁটার অভাবে ধুলিশয্যা আশ্রয় করতে

হোত। পান্না বললে—চা একটু খাবে না? সকাল বেলা চা খাওনি তো।

কথাটা আমার ভাল লাগলো, ও যদি বলতো, চা একটু খাবো তা হোলে ভাল লাগতো না। ও যে আমার সুখ সুবিধে দেখচে, গৃহিণী হয়ে পড়েচে এর মধ্যেই, এটা ওর নারীত্বের সপক্ষে অনেক কিছু বললে। সত্যিকার নারী।

আমি বললাম—দোকান থেকে আনি—

—তাও তো পাত্র নেই, পেয়ালা নেই, চা খাবে কিসে?

—নারকোলের খোলায়।

দু'জনেই হেসে উঠলুম একসঙ্গে। উচ্চরবে মন খুলে, এমন হাসিনি অনেকদিন। পান্না বেশ মেয়ে, সঙ্গিনী হিসাবে আনন্দ দান করতে পারবে প্রতি মুহূর্ত্তে। সুরবালার মত দেবী সেজে থাকবে না।

সকাল ন'টা। রান্নার কি ব্যাপার হবে ওকে জিজ্ঞেস করলাম। দু'জনে আবার পরামর্শ করতে বসি। অমন সাজানো ঘর-সংসার ছেড়ে এসে রিক্ততার আনন্দ নতুন লাগচে। এখানে আমাকে নতুন করে সব করতে হবে। কিছু নেই আমার এখানে।

পান্না বললে—কাছে হোটেল নেই?

—তা বোধ হয় আছে।

—দু'থালা ভাত নিয়ে এসো আমাদের জন্যে, এবেলা কিছুরই যোগাড় নেই, ওবেলা যা হয় হবে।

—থালা দেবে?

—তুমি খেয়ে এসো, আমার জন্যে নিয়ে এসো শালপাতা কি কলার পাতা কিনে।

—সে বেশ মজা হবে কি বলো?

—খুব ভালো লাগবে। তুমি নাইবে, তোমার কাপড় আছে?

—কিছু না। শুধু হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েচি। কাপড় কোথায়?

—আমার শাড়ী পোরো একখানা। নিয়ে নাও। কলের জল চলে যাবে।

নতুন ঘরকন্না নতুন সংসারের। সহস্র অসুবিধে থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। হোটেলের অখাদ্য ডাল ভাত আর শাক বেগুনের চচ্চড়ি খেয়ে কি খুসি দু'জনে। আমার দিক থেকে এটুকু বলতে পারি, আমার দেশের সংসারের অবস্থা অসচ্ছল নয়, সুরবালা আমার খাওয়া দাওয়ার দিকে সর্ব্বদা নজর রাখতো, সুতরাং হোটেলের ডাল-ভাতের মত খাদ্য আমার মুখে জীবনে ক'দিনই বা দিয়েচে। কিন্তু তবুও তো খেলুম, বেশ আনন্দ করেই খেলুম।

পান্না উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলে দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলে। বললে—পান নিয়ে এসো দু পয়সার। পয়সা দিচ্চি—বলেই পেঁটরা খুলতে বসলো। আমি হেসে বললাম—শুধু পানের দাম কেন, তা হোলে এক বাক্স সিগারেটের দামও দাও। ওর মুখ দেখে মনে হোল ও আমার এ কথাটাকে শ্লেষ বলে ধরতে পারেনি, দিব্যি সরলভাবে একটা টাকা আমার

হাতে তুলে দিয়ে বললে—টাকাটা ভাঙিয়ে পান সিগারেট কিনে এনো।

—কত আনবো ?

—এক বাক্স আনবে, না একসঙ্গে তু'বাক্সই নাহয় আনো। আবার দরকার হবে তো ?

—যদি কিছু ফেরৎ না দিই ?

—কেন, আর কিছু কিনবে ? তা যা তোমার মন হয় নিয়ে এসো।

—কত টকা আছে তোমার কাছে দেখি ?

পান্না তোরঙ্গ থেকে একখানা খাম আর একটা পুঁটুলি বের করে গুনতে আরম্ভ করলে। চল্লিশ টাকা আর কয়েক-আনা পয়সা দেখা গেল ওর পুঁজি। আমি বললাম—মোটে ?

ও বেশ সরল ভাবেই বললে—এর মধ্যে আবার মুজরো করতে গেলেই হাতে পয়সা হবে।

—সে কি ! তুমি আবার খেমটা নাচ নাচতে যাবে নাকি ?

—যাবো না ?

—তুমি আমার স্ত্রী পরিচয়ে এখানে এসে আসরে খেমটা নাচতে যাবে ?

পান্না বোধ হয় এ কথাটা ভেবে দেখেনি, সে বললে—তবে আমার টাকা আসবে কোথা থেকে ?

—দরকার কি ?

—তুমি দেবে এইতো? কিন্তু আমি কত টাকা রোজগার করি তুমি জানো? দেখেছিলে তো মঙ্গলগঞ্জে?

—কত?

—ছ'টাকা করে কি রাত। নীলি নিতো সাত টাকা।

—মাসে ক'বার নাচের বায়না পাও?

—ঠিক নেই। সব মাসে সমান হয় না। পাঁচ ছ'টা তো খুব। দশটাও হোত কোনো মাসে।

—তার মানে মাসে গড়ে ত্রিশ বত্রিশ টাকা, এই তো?

—তার বেশি। প্রায় চল্লিশ টাকা।

আমি মনে মনে হাসলাম। পান্না জানে না ডাক্তারিতে একটা রুগী দেখলে অনেক সময় পাড়াগাঁয়ে ওর বেশিও পাওয়া যায়! আমায় ভাবতে দেখে পান্না বললে—ধরো যদি নাচের বায়না না নিতে দাও তবে কলকাতার সংসার চালাবে কি করে? তোমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, কলকাতার খরচ কি জানো? ষাট টাকার কমে মাস যাবে না। তুমি একা পারবে চালাতে?

আমার হাসি পেল। আমি বললাম—আমায় একটা কিছু বাজাতে শেখাবে?

—কি?

—এই ধরো বাঁশি কি ডুগি তবলা।

—কেন?

—গানের দলে তোমার সঙ্গে বেরুতাম। দুজনে রোজগার হোত।

—ইস্। ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি। গানের দলে ডুগি তবলা বাজানোর দাম আছে সে তোমার কর্ম্ম নয়। আমি তো যেমন তেমন, নীলির নাচে বাজাতে পারা যার তার বিদ্যেতে কুলোবে না। হ্যাঁ গো মশাই, নীলি থিয়েটারে নাচতো তা জানো ?

—সখীর ব্যাচে তো ? সে যে-কোনো ঝি নাচতে পারে। তাতে বিশেষ কি কৌশল বা কারিকুরি আছে ?

পান্না হাসতে হাসতে বললে—তুমি নাচের কি বোঝো যে ওই সব কথা বলচো ? আমরা কষ্ট করে নাচ শিখেছি, কত বকুনি খেয়ে, কত অপমান হয় তা জানো ? কিসে কি আছে না আছে তুমি কিছুই জানো না।

—তোমার নাচের সরঞ্জাম সব এখানে আছে ?

—নেই ? ওমা, তবে করবো কি ? সব আছে।

—আজ আমার সামনে নেচে দেখাবে না ?

—ওবেলা। রাত্তিরে। এখন একটু ঘুমুই ! বড্ড ঘুম পাচ্চে।

পান্না ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ওর নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে থাকি। আমার বয়েস আর ওর বয়েসের কত তফাৎ। আমি চল্লিশ, পান্না ষোলো বা সতেরো। এ বয়সের মেয়ে আমার মত বয়সের লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে ?

নিশ্চয়ই এ প্রেম। পান্না আমাকে ভালো না বাসলে আমার সঙ্গে ঘর দোর আত্মীয় স্বজন ছেড়ে পালিয়ে এল কেন ?

তা কখনো আসে? নারীর প্রেম কি বস্তু কখনো জানিনি জীবনে। সুরবালাকে বিবাহ করেছিলুম, সে অন্যরকম ব্যাপার। এ উন্মাদনা তার মধ্যে নেই। অল্পবয়সের বিবাহ, সুরবালা আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট—এ অবস্থায় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এক ধরনের সাংসারিক ভালবাসা হোতেই পারে, আশ্চর্য্য নয়। একটি পরম বিস্ময়ের বোধ ও তজ্জনিত উন্মাদনা সে ভালোবাসার মধ্যে ছিল না। সে তো আগে থেকেই ধরে নিয়ে বসেছিলাম সুরবালা আমায় ভালবাসবেই। ভালোবাসতে বাধ্য। এ রকম মনোভাব প্রেমের পক্ষে অনুকূল নয়। কাজেই প্রেম সেখান থেকে শতহস্ত দূরে ছিল।

কিন্তু জিনিষপত্রের কি করি?

জিনিসপত্র না হোলে বড় মুস্কিল। পান্না শুয়ে আছে শুধু মেজেতে একখানা চাদর পেতে। সতরঞ্চি নেই, কার্পেট নেই—একখানা মাদুর পর্য্যন্ত নেই। সংসার পাততে গেলে কত কি জিনিস দরকার তা কখনো জানতাম না। সাজানো সংসারে জন্মেছি, সাজানো সংসারে সংসার পাতিয়েছিলাম। এখন দেখছি একরাশ টাকা খরচ হয়ে যাবে সব জিনিস গোছাতে। কিছুই তো নেই। থাকবার মধ্যে আছে আমার এক সুটকেস, পান্নার এক টিনের পেটরা, তাতে ওর [illegible] চোপড়। মাথায় দেবার একটা বালিস নেই, জল খাবার একটা গ্লাসও নেই। দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হোল না।

পান্না ঘুম থেকে উঠলে আমি ওকে [illegible] বলি।

পান্নার মুখ কি সুন্দর দেখাচ্চে। অলস, ঢুলুঢুলু, ডাগর ডাগর চোখ দু'টিতে তখনও ঘুম জড়ানো। ও কোনো কিছুই গায়ে মাখে না। হাসিখুসি আমোদ নিয়েই ওর জীবন। হেসে বললে—বেশ মজা হয়েচে, না?

—মজাটা কি রকম? এখুনি যদি জল খেতে চাই, একটা গ্লাস নেই। ভারি মজা!

—একটা কাঁচের গ্লাস কিনে নিয়ে এসো না? বাজারে পাওয়া যাবে তো।

—তবেই সব হোল। তুমি কিচ্ছু বোঝো না পান্না। ঘরসংসার কখনো পাতাওনি। তোমার দেখচি নির্ভাবনার দেহ।

পান্না হঠাৎ পাকা গিন্নির মত গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—তাইতো। কি করা যায় তাই ভাবচি।

রাত্রে পান্না বড় মজা করলে।

দেওয়ালের কাছে একটা শাড়ি পেতে আমাকে বললে—তুমি এখানে শোবে।

—তুমি?

—এইখানে দেওয়ালের ধারে।

—মধ্যে প্রসান্ত মহাসাগরের ব্যবধান। রাত্রে যদি তোমার ভয় করে?

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারিনে বাপু, ভয় করবে কেন? কত জায়গাতে ঘুরলো আমি। কত জায়গায় ঘুরেচি ঘুরবো করতে।

—বড্ড সাহসিকা তুমি।

—নিশ্চয়ই সাহসিকা।

পান্না হেসে উঠলো এবার।

—থাক বাপু, যাতে যার সুবিধে হবে সে তাই করুক।

আমি কিন্তু ঘুমুতে পারলুম না সারা রাত। পান্না আমার এত কাছে থাকবে, একই ঘরে, এ আমার কাছে এতই নতুন যে নতুনত্বের উত্তেজনায় চোখে ঘুম এলো না আমার।

দুজনেই গল্প আরম্ভ করে দিলাম।

—কি রকম মুজরো করো তোমরা?

—যেমন সবাই করে, তোমার যেমন কথাবার্ত্তা।

—বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে?

—কেন করবে?

—বাড়ি ছেড়ে থেকে অভ্যেস হয়ে গিয়েচে কি না?

—আমি আর নীলি কত দেশ ঘুরেচি।

—কোন্ কোন্ দেশ?

—কেষ্টনগর, দামুড় হুদো, চাকদা, জঙ্গিপুর আরও কত জায়গা।

—নীলির জন্যে মন কেমন করচে?

—কিছু না।

—আমার কাছে থাকবে?

—কেন থাকবো না? তবে এলাম কেন?

আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারচি না পান্না কি সব দিক ভেবে ভেবে আমার কাছে এসেচে? আমার বয়েস কত বেশি

ওর তুলনায়। আমার সঙ্গে সত্যি ওর ভালবাসা হোতে পারে ?

কি জানি, এই রহস্যটাই আমার কাছে সব চেয়ে বেশি রহস্য।

নানা কথাবার্ত্তায় এই কথাটা আমি পান্নার কাছ থেকে জানতে চাই। ওর মনোভাব কি এ কথা; ওই কি আমায় বলতে পারে ? সকাল হবার আগে পান্না আমায় বললে—একটু ঘুমুই ?

—ঘুম পাচ্চে ?

—পাবে না ? ফর্সা হোয়ে এল যে পূবে।

—ঘুমোও না একটু।

একটু পরে ভোর হয়ে গেল।

পান্না তখন অঘোরে ঘুমুচ্চে। ডান হাতে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমুচ্ছে ও, দেখে মায়া হোল। মা ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে ও কিসের আশায় চলে এল আমার সঙ্গে ? পান্না ভদ্রঘরে কুলবধূ বা কুমারী নয়, গৃহত্যাগ করে চলে এসেচে আমার সঙ্গে।

আবার যখন অসুবিধে হবে, ও চলে যেতে পারবে, আটকাচ্চে কোথায় ?

আমি চায়ের দোকানে চা খেয়ে পান্নার জন্যে চা নিয়ে এলাম।

পান্না উঠে চোখ মুছচে।

—ও পান্না ?

পান্না এক কাণ্ড করে বসলো। তাড়াতাড়ি উঠে মাথায় আঁচল দিয়ে আমায় এসে এক প্রণাম ঠুকে দিলে।

আমি হেসে উঠলুম। বলি এ কি ব্যাপার?

—কেন? নমস্কার করতে নেই?

—থাকবে না কেন? হঠাৎ এত ভক্তি?

—ভক্তি করতে কিছু দোষ আছে?

—কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো?

—বলো যেন শীগ্‌গির করে মরে যাই।

—কেন জীবনে এত অরুচি হোল কবে?

—বেশিদিন বেঁচে কি হবে? তুমি তো বামুন?

—তাতে সন্দেহ আছে নাকি? তুমি কি জাত?

—বাবা ছিলেন ব্রাহ্মণ। মায়ের মুখে শুনেছি।

—ওসব ভুল কথা। তোমার মা বংশের কৌলিন্য বাড়াবার জন্যে ওই কথা বলেছেন। আমার বিশ্বাস হয় না।

—ভয় কিসের? আমি কি বলবো আমায় বিয়ে কর?

—সে কথা হচ্ছে না। আমি বলচি তুমি যে জাতই হও, আমার কাছে সব সমান। বামুনই হও আর তাঁতিই হও—চা খাবে না?

—চা এনেচ?

—খেয়ে নাও জুড়িয়ে যাবে।

এইভাবে সেদিন থেকে আমাদের নতুন জীবনযাত্রা নতুন দিনে নতুনভাবে সুরু হোল। আমার হাতে নেই পয়সা। বাড়ি থেকে কিছু [illegible] নিয়ে [illegible]।

সস্তায় দু'খানা মাদুর কিনে আনলুম। শালপাতা কুড়িদরে কিনে আনি দু'বেলা ভাত খাওয়ার জন্যে। পান্না তাতে এতটুকু অসন্তুষ্ট নয়। যা আনি, ও তাতেই খুসি। আমার কাছে মুখ ফুটে এ পর্য্যন্ত একটা পয়সাও চায়নি। বরং দিতে এসেচে ছাড়া নিতে চায়নি। অদ্ভুত মেয়ে এই পান্না।

রাস্তায় নেমে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম কেউ কোনো দিকে নেই। কি জানি কেন, আজকাল সর্ব্বদাই আমার কেমন একটা ভয় ভয় হয়, এই বুঝি আমাদের গ্রামের কেউ আমাদের দেখে ফেললে। আমার এ সুখের সংসার একদিন এমনি হঠাৎ, সম্পূর্ণ আকাস্মিকভাবে ভেঙে যাবে।

আমার বুক সর্ব্বদা ধড়ফড় করে ভয়ে। ভয় নানারকম, পান্নাকে হয়তো গিয়ে আর দেখতে পাবো না। ও যে ভালবাসা দেখাচ্চে হয়তো সব ওর ভাণ। কোনদিন দেখবো ও গিয়েচে পালিয়ে।

চা নিয়ে ফিরে এলুম। তখনও পান্নার চুলবাঁধা শেষ হয়নি।

পান্না বললে—খাবার কই ?

—খাবার আনিনি তো !

—বাঃ, শুধু চা খাবো ?

—পয়সাতে কুলোলো কই ? চার আনাতে কি হবে।

—পাউডারের কৌটোর মধ্যে যা ছিল সব নিয়ে গেলে না কেন ? আবার যাও, নিয়ে এসো। একটা টাকা নিয়ে যাও।

টাকা নিয়ে আমি বেরিয়ে চলে গেলুম এবং গরম গরম [illegible] কচুরী খান [illegible] একটা ঠোঙায় নিয়ে

ফিরলুম একটু পরেই। আমি সচ্ছল গৃহস্থঘরের ছেলে, নিজেও যথেষ্ট পয়সা রোজগার করেছি ডাক্তারি করে, কিন্তু এমন ভাবে মাদুরের ওপর বসে শালপাতার ঠোঙায় কচুড়ী খেয়ে সেদিন যা আনন্দ পেয়েছিলাম, আমার সারা গৃহস্থ-জীবন তেমন আমোদ ও তৃপ্তি কখনো পাইনি।

পান্নাকে বললাম—পান্না, পয়সা ফুরিয়ে যাচ্চে, কি হবে বাসাখরচ চলবে কিসে ?

ও হেসে বললে—বারে, আমার কাছে ত্রিশ বত্রিশ টাকার বেশি আছে না ?

—তুমি নিতান্ত বাজে কথা বলো। খরচের সম্বন্ধে কি জ্ঞান আছে তোমার ? ওতে কতদিন চলবে ?

—সোনার হার আছে, কানের দুল আছে।

—তাতেই বা ক'দিন চলবে ?

পান্না একটু ভেবে বললে—তোমাকে ঠিকানা দিচ্চি, তুমি নীলির কাছে যাও। আমরা দু'জনে মিলে মুজরো করলে আমাদের বেশ চলে যাবে।

—সে হবে না।

—কেন ?

—নীলির কাছে গেলেই তোমার মা জানতে পারবে।

—নীলিকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো।

ঠিকানা দাও, আমি এখুনি যাবো।

সন্ধ্যার আগেই ঠিকানা অনুযায়ী নীলিকে খুঁজে বার

করলাম। একটা বড় খোলার বস্তির একটা ঘরে নীলিমা ও তার বড় দিদি সুশীলা থাকে। আমাকে দেখে [illegible] চিনতে পারেনি নীলিমা। আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দেওয়ার পরে সুশীলা এসে আমায় নিয়ে গেল ওদের ঘরের মধ্যে। দু'টো বড় বড় তক্তপোষ একসঙ্গে পাতা, মোটা তোষক পাতা বিছানা, কম দামের একটা ক্লকঘড়ি আছে ঘরের দেওয়ালে এবং যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, খানকতক ঠাকুর দেবতার ছবি। সুশীলার বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, মুখে বসন্তের দাগ না থাকলে ওর মুখ দেখতে একসময় মন্দ ছিল না বোঝা যায়।

সুশীলা থাকাতে আমার বড় অসুবিধে হোল। সুশীলার অস্তিত্বের বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, ওর সামনে সব কথা বলা উচিত হবে না হয়তো। নীলিমাকে নির্জ্জনে কোনো কিছু বলবার অবকাশও তো নেই দেখছি। মুস্কিলে পড়ে গেলাম। সুশীলা ভেবেছে আমি হয়তো ওদের জন্যে কোনো একটা বড় মুজরোর বায়না করতে এসেছি। ও খুব খাতির করে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। বললে—চা খাবেন তো?

—তা মন্দ নয়।

—বসুন, করে নিয়ে আসি। নীলি, বাবুকে বাতাস কর।

—না না, বাতাস করতে হবে না। বোসো এখানে।

সুশীলা ঘর থেকে চলে গেলেই আমি সংক্ষেপে নীলিমাকে সব কথা বললাম। আমাদের ঠিকানাও দিলাম। নীলিমা অবাক

হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললে—আপনি তো মঙ্গলগঞ্জে ডাক্তার ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনি ডাক্তারি করবেন না ?

—কোথায় করবো ? সে সুবিধে দেখচিনে।

—তবে চলবে কি করে ?

—সেজন্যেই তো তোমাকে ডেকেছে পান্না। তুমি গিয়ে দেখা করতে পারবে ? যাবে আমার সঙ্গে ?

—কেন যাবো না ?

—তোমার দিদি কিছু বলবে না তো ?

—না না। দিদি কি বলবে ? আমি এখুনি যাবো। তবে দিদিকে মিথ্যে কথা বলতে হবে। বলবেন, আমি মুজরোর বায়না করতে এসেচি, ওকে একবার পান্নার কাছে নিয়ে যাবো। পান্নাকে দিদি চেনে না।

—মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না। তুমি যা হয় বলো।

সুশীলা চা নিয়ে এল। নীলিমা বললে—দিদি, বাবুর সঙ্গে আমাকে এখুনি একজায়গায় যেতে হবে।

—কেন ?

—বাবুর দরকার আছে। মুজরোর বায়না হবে এক জায়গায়। সেখানে যেতে হবে।

—যা। আমি সঙ্গে আসবো ?

—না তোমায় যেতে হবে না। বাবু আমায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন।

—আজ রাতেই দিয়ে যাবো। ন'টার মধ্যেই।

—সেজন্যে কিছু নয় বাবু, সে আপনি নিয়ে যান না। তবে দু'টো টাকা দিয়ে যাবেন। খরচপত্তর আচে তো? ও গেলে চলে না।

—সে আমি ওর হাতেই দেবো এখন।

—না বাবু, টাকাটা এখুনি আপনি দিয়ে যান।

সুশীলার হাতে আমি টাকাদু'টো দিতে ও খুব অমায়িক ভাবে হাসলে। এরা গরীব, এদের অবস্থা দেখেই বুঝলাম। পান্নারা এদের কাছে বড়লোক। নীলিমা আমাকে বললেও সে কথা রাস্তায় যেতে যেতে। পান্না না হোলে ওদের মুজরোর বায়না হয় না। এর প্রধান কারণ পান্না দেখতে অনেক সুশ্রী এর চেয়ে।

বাসায় ফিরে এলুম। নীলিমাকে দেখে পান্না খুব খুসি, আমায় বললে চা খাবার কিছু নিয়ে এসো। শীগ্‌গির যাও—ওকে পান্না কি বলেচে জানিনে, চা খাবার নিয়ে ফিরে এসে দেখি নীলি কৌতূহলের সঙ্গে বার বার আমার দিকে চাইচে। আমায় বললে—এই অবস্থায় ওকে নিয়ে এসে রেখে দিয়েচেন?

—কেন?

—এ অবস্থায় মানুষ থাকে?

—পান্না তোমাকে বলেছিল কিছু?

পান্না প্রতিবাদ করে বললে—আমি কিছু বলছিলাম নীলি? আমি কিছু বলিনি। ও নিজেই ওসব বলচে। আমি বলি কেন বেশ আছি। তোর ওসব বলবার দরকার কি?

নীলি বললে—খাবি কি? চলবে কি করে?

—সেজন্যেই তো তোকে ডাকা। মুজরোর জোগাড় কর। সংসার চালাতে তো হবে।

—তবে পুরুষ মানুষ রয়েচে কি জন্যে? ও মা—

—ওর ওপর কোনো কথা বলবার তোমার দরকার কি নীলি? ধরো ও পুরুষ মানুষকে আমি নড়তে দেবো না। আমাকে মুজরো করে চালাতে হবে। এখন কি দরকার তাই বলো।

ওর কথা শুনে নীলি অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। এমন কথা সে কখনো শোনে নি। আমিও যে শুনেচি তা নয়। এমন ধরনের কথা ওর মুখে! অভিনয় করচে বলেও তো মনে হয় না। বলে কি পান্না! নীলি বললে বেশ যা ভালো বুঝিস্ তাই কর। আমার কিছু বলবার দরকার কি?

—কি করবি এখন তাই বল?

—মুজরোর চেষ্টা করি। সাজ পোষাক আছে?

পান্না হেসে বললে—সেজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে সব গুছিয়ে এনেছি। ওই করেই যখন খেতে হবে।

নীলিকে আমি আবার পৌঁছে দিয়ে গেলাম। নীলিমা বললে—খুব গেঁথেছেন।

—মানে ?

—মানে দেখলেন না ? ও কি বলে সব কথা। ওর মুখে অমন কথা। পান্নাকে গেঁথেছেন ভাল মাছ। আমি ওকে জানি। ভারি সাদা মন। নিজের জিনিসপত্তর পরকে বিলিয়ে দেয়।

—তোমাকে কোন কথা বলেচে আমার সম্বন্ধে ?

এই কথাটার উত্তর শুনবার জন্যে আমি মরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এ কথার সোজাসুজি উত্তর নীলিমা আমায় দিলে না। বললে—সে কথা এখন বলবো না। তবে আপনার ক্ষমতা আছে। অনেকে ওর পিছনে ছিল, গাঁথতে পারেনি কেউ। আমি তো সব জানি ! হরিহরপুরে একবার মুজরো করতে গিয়েছিলাম, সেখানকার জমিদারের ছেলে ওর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছিল। তাকে ও দূর করে দিয়েছিল এক কথায়। তাই তো বলি, আপনার ক্ষমতা আছে।

নীলিমার কথা শুনে আমি যে কোন স্বর্গে উঠে গেলাম সে বলা যায় না ও অবস্থায় যে কখনো না পড়েচে তার কাছে। জীবনের এ সব অতি বড় অনুভূতি, আমি নিজে আস্বাদ করে বুঝেছি। মন এবং মনের বস্তু। টাকা না কড়ি না, বিষয় আশয় না এমন কি যশমানের আকাঙ্খা পর্য্যন্ত না। ওসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, নিজের সকল প্র্যাকৃটিস ছেড়ে দিয়ে পান্নাকে নিয়ে অকূলে ভেসেচি। ভেসে আজ বুঝতে পেরেচি, ত্যাগ

না করলে বজায় রয় না। আমার অনুভূতিকে বুঝতে হোলে আমার মত অবস্থায় এসে পড়তে হবে।

পান্না আমায় রাত্রে বললে—নীলি পোড়ার মুখী কত কি বলে গেল আমায়।

—কি ?

—বললে, এ সব কি আবার ঢং। ও বাবু কি তোকে চিরকাল এমনি চোখে দেখবে? তুই নিজের আসর নিজে নষ্ট করতে বসেচিস—

—তুমি কি বললে ?

—আমি হেসেই খুন।

আমাকে অবাক করে দিয়েচে পান্না। ওর শ্রেণীর মেয়েরা শুনেছি কেবলই চায়, পুরুষের কাছ থেকে শুধুই আদায় করে নিতে চায়। কিন্তু ও তার অদ্ভুত ব্যতিক্রম। নিজের কথা কিছুই কি ও ভাবে না ?

আমার মত একজন বড় ডাক্তারকে গেঁথে নিয়ে এল, এসে কিছুই দাবি করলে না তার কাছে, বরং তাকে আরও নিজেই উপার্জ্জন করে খাওয়াতে চলেচে। এমন একটি ব্যাপার ঘটতে পারে আমি তাই জানতাম না। তার ওপর আমার বয়স ওর তুলনায় অনেক বেশি। দেখতেও আমি এমন কিছু কন্দর্প পুরুষ নয়। নাঃ, অবাক করেই দিয়েচে বটে।

পান্না নীলিমার সঙ্গে মুজরো করতে যাবে বেথুড়হরি আমি বাসা আগলে তিন চার দিন থাকবো এমন কথা হোল।

যাবার দিন হঠাৎ ও আমাকে বললে—তুমি চলো।

—সেটা ভাল দেখাবে?

—খুব দেখাবে। এই বাসাতে একা পড়ে থাকবে, কি খাবে, কি না খাবে। সেখানে হয়তো কত ভাল ভাল খাওয়া জুটবে। তুমি খেতে পাবে না।

—তাতে কি?

—তাতে আমার কষ্ট হবে না?

—সত্যি, পান্না?

—আহা-হা, ঢং!

পান্না ছাড়লে না। ওদের দলের সঙ্গে আমায় যেতে হোল বেথুডহরি। ভালো কাপড় পরে যেতে পারবো না বলে আধময়লা জামা কাপড় পরে ওদের সঙ্গে গেলাম। সারা রাস্তায় ট্রেনে মহাস্ফূর্ত্তি। আমি যে ডাক্তার সে কথা ভুলে গিয়েচি। ওদের দলে এমন মিশে গিয়েচি যেন চিরকাল খেমটাওয়ালীর দলে তল্পিতল্পা আগলেই বেড়াচ্চি।

পান্না বললে—তুমি যে যাচ্ছ, তুমি নিগুণ যদি জানতে পারে?

—বয়েই গেল।

—ডুগি তবলা বাজাতেও পারো না?

—কিছু না।

—তোমাকে আমি শিখিয়ে দেবো। ঠেকা দিয়ে যেতে পারবে তো অন্ততঃ। দলে একটা কিছু বাজাতে না জানলে লোকে মানবে কেন?

—শিখিও তুমি।

বেণুয়াজহরি গ্রামে বারোয়ারি যাত্রা হচ্চে। সেখানকার নায়েবমশায় উড্ডোগী। নায়েবমশায়ের নাম বঙ্কুবিহারী জোয়ারদার। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, কিন্তু লম্বা-চওড়া চেহারা, একতাড়া পাকা গোঁফ, বড় বড় ভাটার মত চোখ। প্রমথ বিশ্বাস বলে কোন্ জমিদারের এষ্টেটের নায়েব। আমাকে বললেন তোমার নাম কি হে?

আসল নামটা বললাম না।

—বেশ, বেশ! তুমি কি করো?

—আজ্ঞে আমি ভাত রাঁধি।

—ও তুমি বাজিয়ে টাজিয়ে নও।

—আজ্ঞে না।

সন্ধ্যার আগে আসর হোল। অনেক রাত পর্য্যন্ত পান্না আর নীলি নাচলে। পান্না নাচের ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে এসে কথা বলে। জিজ্ঞেস করলে—কেমন হচ্চে?

—চমৎকার।

—তোমার ভাল লাগচে?

—নিশ্চয়ই।

—তুমি কিন্তু উঠো না। তা হলে আমার নাচ খারাপ হয়ে যাবে। নীলি কি বলচে জানো? বোলচে তোমার জন্যেই নাকি আমার নাচ ভাল হচ্চে।

—ও সব বাজে কথা। ভাত রাঁধবো যে।

—না। ছিঃ, ওসব কি কথা?

—তোমরা নেচে গিয়ে তবে খাবে কি? ওরা চাল ডাল দিয়েচে! মাছ কিনে দিয়েচে। আমি রাঁধবো।

—কক্ষনো না। তোমায় যেতে দেবো না। নীলি আর আমি রান্না করবো এর পরে।

নায়েবমশায় সামনেই বসে। আমার দিকে দেখি কট মটিয়ে চাইচেন বোধ হল পান্না যে এত কথা আমার সঙ্গে বলচে এটা তিনি পছন্দ করচেন না। আট দশ টাকা প্যালা দিলেন নিজেই রুমালে বেঁধে বেঁধে—শুধু পান্নাকে।

একটু বেশি রাত হোলে আমাকে একজন বরকন্দাজ ডেকে বললে—আপনাকে নায়েববাবু ডাকচেন।

আমি গেলাম উঠে। নায়েবমশায় আসরের বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। আমায় বললেন—ওই মেয়েটির নাম কি?

আমি বললাম—পান্না।

—তোমার কেউ হয়?

—না। আমার কে হবে?

নায়েবমশায় দেখি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েচে। আমার চেহারার মধ্যে সে যেন কি খুঁজচে। আমাকে আবার বললে—তুমি এখানে এসেচ রান্না করতে বলছিলে না?

—হুঁ।

—ক'টাকা পাও?

—এই গিয়ে সাতটাকা আর খোরাকী।

—বামুন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমাদের জমিদারী কাছারিতে রান্না করবে ?

—মাইনে কত দেবেন ?

—দশটাকা পাবে আর খোরাকী। কেমন ?

—আচ্ছা, আপনাকে ভেবে বলবো।

—এ বেলাই বলবে তো ? এখুনি বলো। আমি বাসা হোতে চা খেয়ে ফিরচি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নায়েবের সামনে থেকে চলে এলাম। হাসি পেলেও হাসি চেপে রাখলাম। নায়েব ভেবেচে আমি ওর মতলবের ভেতরে ঢুকতে পারিনি। ও কি চায় আমার কাছে তা অনেকদিন থেকে বুঝেছি। পাচক সংগ্রহে উৎসাহ ও ব্যস্ততা আর কিছুই নয়। ওর আসল মতলবটা ঢাকবার একটা আবরণ মাত্র।

আমার অনুমান মিথ্যে হতে পারে না এ ক্ষেত্রে। একটু পরে কাছারির একজন বরকন্দাজ এসে বললে—চলো, নায়েকবাবু ডাকচেন।

গিয়ে দেখি নায়েবমশায় চা খাচ্চেন, কাছারির কোণের ঘরে তক্তপোষের ওপর বসে। ঘরে আর কেউ নেই। আমায় দেখে বললেন—এসো, বসো। চা খাবে ?

—আজ্ঞে, আপনি খান।

—খাও না একটু ? এই আছে, ঢেলে নাও।

নায়েবমশায়ের হৃদ্যতায় আমার কৌতুক বোধ হলেও কোনমতে হাসি চেপে রাখি। নিত্য থেকে লীলায় নেমে দেখি না ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়। সত্যিকার রাঁধুনি বামুন তো নই আমি! চা খাওয়া শেষ করে নায়েবমশায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখবার জন্য হাত বাড়িয়ে বললাম—দিন আমার হাতে।

নায়েবমশায় সন্তুষ্ট হলেন আমার বিনয়ে। বললেন—না হে, তুমি বামুনের ছেলে, তোমার হাতে এঁটো পেয়ালাটা দেবো কেন? নাম কি বললে যেন?

আগে যে নামটা বলেছিলাম, সেটাই বললাম আবার।

—কি ভেবে দেখলে? চাকরী করবে?

—মাইনে কম। আজ্ঞে ওতে—

—দশ টাকা মাইনে, কম হোল হে? যাক্‌গে, বারো টাকা দেবো ছ' মাস পরে। এখন দশ টাকাতে ভর্ত্তি হও। এখানে অনেক সুবিধে আছে হে—জমিদারের কাছারি, হাটে তোলাটা আসটা, পালপার্ব্বনে প্রজার কাছ থেকে পার্ব্বণী পাবে দু' চার আনা, তা ছাড়া কাছারীর রাঁধুনী বামুন, ইজ্জৎ কত?

—অতিকষ্টে হাসি চেপে বললাম—আজ্ঞে, তা আর বলতে—

—রাজি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ একটা কথা—

—কি?

—শোবো কোথায়?

—নায়েব অবাক হবার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—শোবে কোথায়? তার মানে?

—মানে আমি একা ছাড়া কারো সঙ্গে শুতে পারিনে কিনা তাই বলছি।

—বেশ, সেরেস্তায় শুয়ো। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন একটা কথা বলি। তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান লোক দেখচি। পান্না বলে ওই মেয়েটাকে আজ রাতে এই ঘরে পাঠাতে হবে তোমাকে। রাত দু'টোর পর। আসর ভেঙ্গে গেলে। এজন্যে তোমাকে আমি দু'টাকা বখশিস্ করবো আলাদা। দেবে এনে?

—আপনি আমায় ভাবনায় ফেলেছেন বাবু। উনি আমার কথা শুনবেন কেন? তাছাড়া আমি ওদের দলের রসুইয়ে বামুন। একথা বলতে গেলে বেয়াদবি হবে না?

তোমার সে দোর তো আগেই খুলে রেখেছিলাম বাপু। আমরা জমিদারি চালাই, আট ঘাট বেঁধে কাজ করি। বেয়াদবি বলেই যদি মনে করে, চাকরিতে রাখবে না এই তো? বেশ, কোন ক্ষতি নেই। চাকুরী তোমার হবেই কাল এখানে। আরও উপরি দুটো টাকা। তবে পান্নাকে বলবে, ওকেও আমি খুসি করবো। আচ্ছা, ও কত নেবে বলে তোমার মনে হয়?

—আজ্ঞে, ওসব খবর আমি কিছু রাখিনে। উনি আমার মনিব, ওসব কথা ওঁর সঙ্গে আমার কি হয়?

[illegible] একটি ধূর্ত লালসার ছাপ [illegible]

ফুটে উঠলো। চোখ টিপে বললেন—তাতে তোমার ক্ষতিটা কি? চাকরি হয়েই গেল। কাকে দিয়ে বলাতে হবে বলো না? নিজে একটু চেষ্টা করে দ্যাখো। যাও বুঝলে? না যদি সহজ হয় তবে—

এই পর্য্যন্ত বলে জোয়ারদ্দার মশায় চুপ করলেন। একটা হিংস্র পশুভাব সে মুখে। আমার মন বললে এ সাপকে নিয়ে আর বেশি খেলিও না, ছোবল বসাবে। পান্নাকে সাবধান করে দিলাম সব কথা খুলে বলে। সে হেসে বললে—ও রকম বিপদে অনেক জায়গায় আমাদের পড়তে হয়েচে। তুমি সঙ্গে রয়েচ ভয় কি? নীলি দিদিকে বলে দেখচি, ও যায় যাক। যেতে পারে ও অমন গিয়ে থাকে জানি।

নায়েবকে এসে বললাম। তখনও আসর ভাঙেনি।

তিনি বসে আছেন ছোট্ট কোণের ঘরটাতে। মুখে সেই অধীর লালসার ছাপ। অশান্ত আগ্রহের সুরে জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো? এসো ইদিকে।

—সে হোল না।

—কি রকম?

—আপনাকে অন্য মেয়েটি জোগাড় করে দিচ্চি। ওর নাম নীলি, ও আসবে এখন।

—ওসব হবে না। ওকে আমার দরকার নেই। পান্নাকে চাই। দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা দেবো। বলে দিয়ে

[illegible]

বরকন্দাজ দিয়ে ধরে এনে কাছারি ঘরে পুরে ফেলি। পারবে ?

—আপনাকে একটা কথা বলি। ও বাজে ধরণের মেয়ে নয়। একটা শেষে কেলেঙ্কারি করে বসবেন ? নীলি আসুক ঘরে, মিটে গেল। ওকে ঘাঁটাতে যাবেন না।

এত কথা বললাম—এই জন্যে যে জোয়ারদ্দার মশায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, পান্নার বাবা কিংবা জ্যাঠামশায়ের বয়সী। এ বয়সে ওর অমন লালসার উগ্রতা দেখে লোকটার ওপর অনুকম্পা জেগেচে আমার মনে। আমার দলের লোক, আমি ত সব ছেড়েচি ওর জন্যে। নেশা এমনি জিনিস। তেমনি নেশা তো ওরও লাগতে পারে।

জোয়ারদ্দার মশায় নাছোড়বান্দা। ওর ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বেড়ে গিয়েছে। যেই শুনেচে পান্নাকে পাবে না, অমনি পান্নাকে না পেলে আর চলচে না। ওকেই চাই, রাণী চন্দ্রমানকেও না।

আমি ওর সব কথা শুনে বললাম—ওর আশা ছাড়ুন।

—কেন ? ওকি ? অর্ডিনারি একটা খেমটাওয়ালী তো ?

—তাই বটে, তবে ও অন্যরকম।

—কি রকম ?

—আপনাকে খুলে বলি। আমি মশাই নিতান্ত রাঁধুনি বামুন নই। আমি ডাক্তার। ওর জন্যে সব ছেড়ে এসেছি। ওর দলে থাকিলে, ওর সঙ্গে এসেচি—

নায়েব অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চে— [illegible]

বললেন—তাই আপনার মুখে অনেকক্ষণ থেকে আমি কি একটা দেখে সন্দেহ করেছিলাম। যাক্, মশাই আপনি কিছু মনে করবেন না। বয়েস কত মশায়ের ?

—চল্লিশ।

—এত ?

—তাই হবে।

—আপনি এত বয়সে কি করে ওর সাথে—ওর বয়েস তো আঠারোর বেশি হবে না।

হেসে বললাম, কি করে বলবো বলুন। ওর কথা কি কিছু বলা যায় ?

—কি ডাক্তার আপনি ? পাশ করা ?

—এম, বি, পাশ।

—সত্যি বলচেন ?

—নায়েবমশায় তড়াক করে চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে আমার দু'হাত নিজের মধ্যে নিয়ে বললেন—মাপ করবেন ডাক্তারবাবু। আমি চিনতে পারিনি। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। একটা কথা বলি, বসুন এখানে। চা খাবেন ? ওরে—

—না, না চায়ের দরকার নেই। বলুন কি বলবেন।

—হাত ধরে অনুরোধ করচি—উচ্ছন্ন যাবেন না। ছেড়ে দিন ওকে। ওর আছে কি ? একটা বেশ্যা—নাচওয়ালী—

আমি বাধা দিয়ে বললাম—অমন কথা শুনতে আসিনি ওঁকে

সমালোচনা করবার দরকার কি আপনার? কি বলছিলেন—তাই বলুন।

—জানি, জানি। ও নেশা আমিও জানি মশাই। এ বুড়ো বয়সেও এখনো নেশা ছাড়ে না। ওতেই তো মরেছি। আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে বলতে কি? ও নেশা থাকবে না। ওকে ছেড়ে দিন। প্র্যাকটিস্ করতে হয় ঘর দিচ্ছি, এখানে প্র্যাকটিস্ করুন। সব যোগাড় করে দিচ্চি।

—আচ্ছা, আপনার কথা মনে রইল। যদি কখনো—

—না না, আপনি থাকুন এখানে। এদেশে ডাক্তার নেই। পান্নাকে নিয়েই থাকুন। আমার আপত্তি নেই।

তা হয় না। সবাই টের পেয়ে গিয়েছে ও নাচওয়ালী। এখানে প্র্যাকটিস্ একা হোতে পারে, ওকে নিয়ে হয়না।

—সব হয় মশাই। আমার নাম বঙ্কুবিহারী জোয়ারদ্দার মনে রাখবেন ডাক্তারবাবু। আপনাদের বাপ মার আশীর্ব্বাদে—আপনার নামটি কি—

—না। সেটা বলবো অন্য সময়ে। বুঝতেই পারচেন।

—আপনাকে বলা রইল। যে পথে নেমেচেন, বিপদে পড়লে চিঠি দেবেন। আমি যা করবার করবো ডাক্তারবাবু।

যাবার সময় শেষ রাত্রে নায়েবমশায় নিজে নৌকোয় এসে দাঁড়িয়ে আমাদের জিনিষপত্র তুলবার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন। পান্নার সম্বন্ধে আর কোন কথা মুখেও আনলেন না! আমাকে আর একবার আসতে বললেন বার বার করে। কার মধ্যে যে কি থাকে।

পান্না নৌকোয় বললে—বুড়োটা ক্ষেপেছিল তাহলে?

—সেটা তোমার দোষ। ওর দোষ নয়।

—কি বললে শেষটাতে?

নীলি ঝংকার দিয়ে বললে—তুই ক্যামা দে বাপু। একটু ঘুমুতে দে। নেকু, ওরা কি বলে তুমি জানো না কিনা? খুকি! চুপ করে থাক।

পান্না হেসে বললে—নীলিদির রাগ হয়েচে হাজার হোক—

—আবার ওই কথা! ঘুমুতে দে। বক্ বক্ করতে হয় তোমরা নৌকোর বাইরে গিয়ে বকো।

নৌকোতে উঠে সকালের হাওয়ায় আমার ঘুম এল।

অনেকক্ষণ পরে দেখি পান্না আমায় ডেকে তুলচে। বেলা অনেক হয়েচে। নৌকো এসে ষ্টেশনের ঘাটে পৌঁছে গিয়েচে।

নীলি হেসে বললে—তাহলেই আপনি মুজরোর দলে থেকেচেন। তিন চার রাত জাগতে হবে অনবরত। ঘুমুতে পারবেন না মোটে, তবেই মুজরো পাওয়া যায়। আমাদের সব অভ্যেস হয়ে গিয়েচে।

গাড়ীতে উঠে নিরিবিলি পেয়ে পান্না আমায় বললে—কত টাকা পেলাম বলতো?

—কি জানি?

—তোমায় দেব না কিন্তু—হুঁ হুঁ—

ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বলে।

আমি হেসে বলি—[illegible] না, জেনে কি নিচ্ছি?

—বিশ্বাস কি ?

পান্না একটা রঙীন রুমালের খুঁট খুলে দেখালে একখানা দশটাকার নোট আর খুচরো রূপোর টাকা গোটা বারো, একে একে গুণলে।

আমি বললাম—নীলির ভাগ আছে তো এতে ?

—ওর ভাগ ওকে দিয়েচি। এ তো প্যালার টাকা। নীলিকে কেউ প্যালা ছায়নি তো ?

—ছায়নি ?

—আহা, কবে ছায় ?

—তাব মানে তুমি রূপসী বালিকা, তোমাব দিকে সকলের চোখ ?

—যাও।

—সত্যি। জানোনা কি হয়েছিল কাল ? নীলি বলেনি তোমায ?

—না। কি হয়েছিল গো ?

—নাযেবের চোখ পড়েছিল তোমার দিকে।

—সে কি রকম ?

—ওকে সব খুলে বললাম। ও শুনে বললে—কত জায়গায় এ বকম বিপদে পডতে হয়েচে। তবে তোমাকে নিয়ে এসেছিলুম কেন ? সঙ্গে পুরুষ না থাকলে কি আমাদের বেরুনো চলে ?

হেসে বললাম—ঢং কোরো না পান্না।

—সব জায় গায় সতী ছিলে তুমিও? বিশ্বাস তো হয় না।

পান্না গম্ভীর মুখে বললে—না। তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলবো না। ভাবনহাটি তালকোলার জমিদার বাড়িতে কি একটা বিয়ে উপলক্ষে আমরা গেলুম মুজরোতে। জমিদারের ভাইপোর বিয়ে। সেই বিয়ের নতুন বর ভাইপো ক্ষেপে উঠলো আমায় দেখে সেই রাত্তিরে। আমায় নৌকোতে করে সারা রাত নিয়ে বেড়ালে।

—বলো কি?

—তারপর শোনো। সেই লোক বলে—আমরা চলো যাই কলকাতায় পালিয়ে। নতুন বৌকে ফেলে। বিয়ে হয়েচে, তখনও বুঝি ফুলশয্যে হয়নি। বলো কত টাকা চাও, বলো কত টাকা চাও—আমাকে হাতে ধরে পীড়াপীড়ি। কত বোঝাই—শেষে না পেরে বলি হাজার টাকা মাসে নেবো। তখন কাঁদতে লাগলো। পুরুষ মানুষের কান্না দেখে আমার আরও ঘেন্না হয়ে গেল। বলচে, আমার তো নিজের জমিদারি নয়, বাবা কাকা বেঁচে। হাজার টাকা করে মাসে কোথা থেকে দেবো? তবে নতুন বৌয়ের গায়ের তিন হাজার টাকার গয়না আছে, তুমি যদি রাজী হও আজ শেষ রাত্তিরে সব গয়না চুরি করে আনবো। শুনে তো আমি অবাক। মানুষ আবার এমন হয় নাকি? পুরুষ জাতের ওপর ঘেন্না হয়ে গেল। নতুন বউ, তার গয়না নাকি চুরি করে [illegible] বলেছে। আমি সেই যে ফিরে [illegible], আর

ওর সঙ্গে দেখা করিনি। বলে, নিজের গলায় নিজে ছুরি দেবে। আমি মনে মনে বলি, তাই দে।

—চলে এলে?

—তার পরের দিনই।

—অত টাকা তোমার হোত।

—অমন টাকার মাথায় মারি সাত ঝাড়ু। একটি নতুন বৌ, ভাল মানুষের মেয়ে—তাকে ঠকিয়ে তার গা খালি করে টাকা রোজগার? সে লোকটা না হয় ক্ষেপেছে, আমি তো আর তাকে দেখে ক্ষেপিনি? আমি অমন কাজ করবো?

পান্নার মুখে একথা শুনে খুব খুশি হোলাম। পান্না যে আবহাওয়ায় মানুষ, যে বংশে ওর জন্ম, তাতে তিন হাজার টাকার লোভ এভাবে ত্যাগ করা কঠিন। ও যদি আমার কাছে মিথ্যে না বলে থাকে তবে নিঃসন্দেহে পান্না উঁচু দরের জীব।

বৌবাজারের বাসায় এসে নীলি চলে গেল। বিকেল বেলা। পান্না কলে কাপড় কেচে গা ধুয়ে এল। সত্যি, রূপসী বটে পান্না। সাবান মেখে স্নান করে ভিজে চুলের রাস পিঠে ফেলে একখানা বেগুনি রংয়ের ছাপাশাড়ী পরে ও যখন ঘরে ঢুকলো, তখন তালকোলার জমিদারের ভাইপো তো কোন্ ছার, অনেক রাজা মহারাজের মুণ্ডু সে ঘুরিয়ে দিতে পারতো, এ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

পান্না সেই রঙীন রুমালের খুঁট খুলে টাকাগুলো সব

মেজেতে পাতলে। বললে—কত টাকা গো? এই দশ, এই পাঁচ—

—থাক, গুনচো কেন?

—তুমি নেবে না?

—এখন রাখো তোমার কাছে। খরচ পত্তর তুমিই তো করবে।

—আমার বাক্স নেই। তোমার বাক্সে রাখো।

—তাহোলে এক কাজ করো। টাকা নিয়ে বাজারে যাও, দু'টো চায়ের ডিসপেয়ালা, ভালো চা, চিনি, এ বেলার জন্য কিছু মাছ আর আলু পটল আনো। মাছের ঝোল ভাত করি। একখানা পা-পোষ কিনে এনো তো? যত রাজ্যির ধুলো শুদ্ধু ঘরে ঢোক তুমি।

—তা আর বলতে হয় না।

—না হয় না, তুমি জুতো ঘরে নিয়ে ঢুকো না। পা-পোষ একখানা এনো, ওখানে থাকবে। আর ধুনো এনো, সন্দেবেলা ধুনো দেবো।

—তুমি যে সাধু হয়ে উঠলে দেখচি। আবার ধুনো?

পান্না বিরক্তমুখে বললে—আহা কি যে রঙ্গ করো। গা যেন জ্বলে যায় একেবারে। ও মুখ ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গিতে চলে গেল।

কি সুন্দর লাবণ্যময় ভঙ্গি ওর। চোখ ফেরানো যায় না। সত্যি, কোন্ স্বর্গে আমায় রেখেচে ও? ওকে পেয়ে দুনিয়া ভুল হয়ে গিয়েচে আমার। আমার পূর্ব্ব জা মের কথা

কিছুই মনে নেই। সুরবালা টুরবালা কোথায় তলিয়ে গিয়েচে। বাজার করে একটা ছোট পার্কের বেঞ্চির ওপর বসে বসে এই সব ভাবি। এই বেঞ্চিটা আমার প্রিয় ও পরিচিত, অনেকবার ওর কথা ভেবেচি এটাতে বসে।

বাসায় ঢুকতে পান্না বললে—ওগো আর একবার যেতে হবে বাজারে—

—কেন ?

—দইওয়ালী এসেছিল, তোমার জন্যে দই কিনে রেখেচি। পাকা কলা নিয়ে এসো। খাবে—

অবার পাকা কলা কিনতে বেরুই। এতেও সুখ। আমি কত স্বচ্ছল অবস্থায় মানুষ, পান্না তার ধারণাও করতে পারবে না। সব ছেড়ে ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু' এক টাকার বাজার করচি, পায়ে জুতো ছিঁড়ে আসচে, গায়ে মলিন জামা —যে আমি দিনে তিনবার ধুতি পাঞ্জাবী বদলাতুম, তার এই দশা। কিছু না। সংসার অনিত্য। প্রেমই বস্তু। তা এতদিনে পেয়েছি। বস্তুলাভ ঘটেচে এতকাল পরে। আর কিছু চাই না।

দুপুর বেলা পান্না রেঁধে বললে—খাবে কিসে ?

—কেন শালপাতায় ?

—দোহাই তোমার, তোমার জন্যে অন্তত: একখানা থালা কিনে আনো।

—কিছু পয়সা দাও দেখি ?

—কত ?

—অন্ততঃ দশটা টাকা। দুখানা থালা কিনে আনি।

—এখন? আমার হাতে এঁটো। বাক্সে আছে। চাবি নিয়ে বাক্স খুলতে পারবে?

আমি হেসে বললাম—না পান্না। আমি নিজেই আনছি কিনে। আমার কাছে আছে।

ওর ধরণ আমার খুব ভাল লাগলো। ও পয়সা দিতে চাইলে, কোনো প্রতিবাদ করলে না। ওর তো খরচ করার কথা নয়, খরচ করার কথা আমার। অথচ ও অকাতরে বাক্স খুলে পয়সা বার করে দিলে কেন? পান্না অন্য ধরণের মেয়ে, ওকে যতই দেখছি, ওকে অন্য জাতের মেয়ে বলে মনে হচ্চে। ওদের শ্রেণীর অন্য মেয়ের মত নয় ও।

আমি দু'খানা এনামেলের থালা কিনে আনলাম। হাতে বেশি পয়সা নেই। পান্না দেখে হেসেই খুশি। আমি শেষে কিনা এনামেলের থালা কিনে আনলাম? কখনো এ থালায় খেয়েছি আমি?

—খাই নি?

—হি-হি-হি—

—অত হাসি কিসের?

—জব্দ গো জব্দ। বড্ড জব্দ হয়েচ এবার।

—কিসের জব্দ?

—পয়সা ফুরিয়েচে তো হাতে? এবার নীলিকে খবর দাও। দু'জনে মুজরো করে আনি। না হোলে খাবে কি অবড়ংকা?

পান্না দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলে নাচিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে হেসে আবার গড়িয়ে পড়লো।

আমার কি যেন একটা হয়েচে, পান্না যা করে আমার বেশ ভাল লাগে, যে কথাই বলুক বা যে ভঙ্গিই করুক। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর হেসে-লুটিয়ে-পড়া তনুলতার দিকে চেয়ে রইলাম! অপূর্ব সুশ্রী মেয়ে পান্না।

আর একটা কথা ভেবে দেখলাম বিকেলে একটা পার্কে নিরিবিলি বসে। আমার হাতে আর অর্থ নেই বা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি এ জিনিষটা পান্নার পক্ষে আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। কিন্তু এটাকে ও অতি সহজভাবেই মেনে নিয়ে তার প্রতিকারও করতে চাইলে। ও নিজে উপার্জ্জন করে এনে খাওয়াবে আমাকে ভেবেচে নাকি? ও অতি সরল। কিন্তু এই সরলতা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অভিনব। আমি এর আস্বাদ পেয়ে ধন্য হোলাম।

পান্নাকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারলাম না। কেমন সহজভাবে ও আমার নিঃস্বতার বার্ত্তাকে গ্রহণ করলো? কত সম্ভ্রান্ত ঘরের বিবাহিতা স্ত্রীরা এত সোজাভাবে স্বামীর ব্যাঙ্ক ফেল মারার বার্ত্তাকে পরিপাক করতে পারতো না। পান্নার শালীনতা অন্য রকমের, ও বেশি কখনো পায়নি বলেই বেশি চায় না—তাই কি? এই অবস্থাটাই বোধ হয় ওর কাছে সহজ।

পান্না আমাকে ভালবাসে নিশ্চয়ই। ভাল না বাসলে ও এমন বলতে পারতো না। আমার বয়েস হয়েচে, একটি

ষোড়শী সুন্দরী কিশোরী আমাকে অমন ভালবাসবে, এ আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। সত্যি কি পান্না আমাকে ভালবেসে ফেলেচে? না, বিশ্বাস করা শক্ত, বড় শক্ত। একবার বিশ্বাস হয়, একবার হয় না।

পার্কের বেঞ্চিটার ও-কোণে একটা চানাচুর ভাজাওয়ালা এসে বসলো। আমায় বললে—বাবু, দেশলাই আছে? আমি তাকে দেশলাই দিলাম। চলে যা না কেন বাপু, তা নয় সে আবার আমার সঙ্গে খোসগল্পে প্রবৃত্ত হয়, এমন ভাব করে তুললে। আমার কি এখন ওই সব বাজে কথা ভাল লাগচে?

আবার নির্জ্জন হোল পার্কের কোণ। আবার আমি বসে ভাবি।

পান্না আমাকে ভালবাসে, ভালবাসে, ভালবাসে।……

কি একটা অদ্ভুত শিহরণ ও উত্তেজনা আমার সর্ব্বদেহে। চুপ করে বসে শুধু ওই কথাটাই ভাবি। শুধু ভেবেই আনন্দ। এত আনন্দ যে আছে চিন্তার মধ্যে, এত পুলক, এত শিহরণ, এত নেশা, এ কথাই কি আগে জানতাম? যেন ভাঙ খাওয়ার নেশার মত রঙীন নেশাতে মশগুল হয়ে বসে আছি। জীবনে এরকম নেশা আসে চিন্তা থেকে তাই বা কি আগে জানতাম?

সুরবালার সঙ্গে এতদিনের ঘরকন্না আমার ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে।

ভালবাসা কি জিনিস, ও আমাকে শেখায় নি।

যদি কখনো না জানতাম এ জিনিস, জীবনের একটা মস্ত বড় রসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতাম।

সুরবালার চিন্তা আমাকে কখনো নেশা লাগায় নি।

কিন্তু কেন? সুরবালা সুন্দরী ছিল না, তা নয়। আমাদের গ্রামের বৌদের মধ্যে এখনো সুন্দরী বলে সে গণ্য। এখন তার বয়েস পান্নার ডবল হোতে পারে কিন্তু একসময়ে সেও ষোড়শী কিশোরী ছিল। কিন্নরকণ্ঠি না হোলেও সুরবালার গলার সুর মিষ্টি। এখনো মিষ্টি। ষোড়শী সুরবালাকে আমি বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু কিসের অভাব ছিল তার মধ্যে? অভাব কিসের ছিল তখন তা বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি পান্নার ভালবাসা পেয়ে আমার এই যে নেশার মত আনন্দ, এই আনন্দ সে দিতে পারে নি। নেশা ছিল না ওর প্রেমে। ওর ছিল কি না জানি নে, আমার ছিল না। এতে যে নেশা হয় তাই জানতাম না, যদি পান্নার সঙ্গে পরিচয় না হোতো। এর অস্তিত্বই আমার অজ্ঞাত ছিল।

রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাচ্চে। পার্কে মেলা লোক বেড়াচ্চে। এদের মধ্যে ক'জন লোক এমন ভালবাসার আনন্দ আস্বাদ করেছে জীবনে? ওই যে লোকটা ছাতি বগলে যাচ্চে, ও বোধ হয় একজন স্কুল মাষ্টার। ও জানে ভালবাসার আস্বাদ? ওর পাশের বাড়ির কোনো দুরধিগম্য সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে হয়তো ছাদে ছাদে দেখা হয়—না কি? হয়তো সেইজন্যে ও ছুটে ছুটে যাচ্চে বাসায়?

যদি না জানে ওর আস্বাদ, তবে ওরা বড্ড দুর্ভাগা। অমৃতের আস্বাদ পায়নি জীবনে।

ভালবেসে আনন্দ নয়, ভালবাসা পেয়ে আনন্দ। এ কোনো [illegible] ব্যাপার নয়, নিছক সার্থপর ব্যাপার।

একটু আস্বাদ করে আরও আস্বাদ করতে প্রাণ ব্যগ্র হয়ে পড়ে। বেলা পড়লে উঠে বাসায় ফিরলুম। পান্না কি সত্যই আছে? ও স্বপ্ন না তো? না, পান্না বসে চুল বাঁধচে। ওর সেই তোরঙ্গটা থেকে আয়না বের করেচে, দাঁত দিয়ে চুলের দড়ির প্রান্ত টেনে ধরেচে, বেশ ভঙ্গিটি করেচে।

চমকে উঠে বললে—কে?

পিছন ফিরে চাইতে গেল তাড়াতাড়ি।

আমি বললাম—দোর খুলে রেখেচ কেন? একলা ঘরে থাকো, যদি চোর ঢোকে? বন্দ করে রেখো।

ও অপ্রতিভ হয়ে বললে—আচ্ছা।

—চুল বাঁধচো?

—দেখতে পাচ্ছো না? চা খাবে তো?

—নিশ্চয়ই।

—চা চিনি নিয়ে এসো। কিছুই নেই।

—পয়সা দাও।

—নিয়ে যাও আমার এই পাউডারের কৌটো খুলে। এই যে—

পয়সা নিয়ে নেমে গেলুম।

দিন কতক বেশ আনন্দেই কেটে গেল।

কিন্তু আমার মনে কেমন এক ধরণের অস্বস্তি সুরু হয়েছে, আমার নিজের উপার্জ্জন এক পয়সাও নেই, পান্নার উপার্জ্জনের অর্থ আমাকে হাত পেতে নিতে হচ্ছে, না নিয়ে উপায় নেই। আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি, এ ভাব কতদিন চলবে। ও যা মুজরো করে এনেছিল, তা ফুরিয়ে এল। কলকাতার খরচ। ওর মনে ভবিষ্যতের ভাবনা নেই, বেশ হাসি গল্প গান নিয়ে সুখেই আছে—কিন্তু আমি দেখছি আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পান্নার টাকায় সংসার বেশীদিন চলা সম্ভব হবে কি? আমি সে টাকা বেশিদিন নিতেও পারবো না?

পান্নাকে কথাটা বললমে।

ও বুঝতে চায় না। বললে—তাতে কি? আমার টাকা তোমার নিলে কি হবে?

—মানে নিলে কিছু হবে না। কিন্তু ওতে চলবে না।

—কেন চলবে না? বেশ তো চলচে।

—এর নাম চলা?

বলেই সামলে নিলুম। পান্না সরল মেয়ে, তার জীবন যাত্রার ধারণাও সরল ও সংক্ষিপ্ত। ওর মা ছিলো মুজরোওয়ালী, যা রোজগার করেচে তাতেই সেকালে সংসার চলে গিয়েচে। বিলাসিতা বাবুগিরি জানতো না। কোনোরকমে খাওয়া পরা চলে গেলেই খুসি। ওরও জীবন যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে যে সহজ ধারণা আছে, আমি তার অপমান করতে চাইনি।

বললাম—ধরো তুমি যদি দু'দিন বসে থাকো, আসরের বায়না না পাও ?

—সে তুমি ভেবো না।

—আমাকে বুঝিয়ে বলো কিসে চলবে। খাবো কি দু'জনে ?

পান্না হি হি করে হেসে ওঠে। ঘাড় দুলিয়ে বলে—খেতে পেলেই ত তোমার হোল ? আমি চুপ করে রইলাম। ও সংসারের কোন খবরই রাখে না। কি কথা বলবো এ সম্বন্ধে ওকে ?

ও বললে—তুমি কি ভাবচো শুনি ?

—ভাবচি আমাকেও টাকা রোজগার করতে হবে।

—বেশ, পার তো করো। আমি কি বারণ করেছি।

—তুমি জানো আমি ডাক্তার। আমাকে কোথাও বসে ডাক্তারখানা খুলতে হবে, তবে রোজগার হবে।

—এই বাসার নিচের তলাতে ঘর খালি আছে, ডাক্তারখানা খোলো।

—তুমি ভারি মজার মেয়ে পান্না! অত সোজা বুঝি! টাকা কই, ওষুধপত্র কিনতে হবে, কত কি চাই। টাকা দেবে ?

—কত টাকা বলো ?

—হাজার খানেক।

—কত ?

—আপাতত: হাজার খানেক।

—উ রে!

পান্না দীর্ঘ শিস দেওয়ার সুরে কথাটা উচ্চারণ করে চুপ করে গেল।

আমি জানি ও অত টাকা কখনো এক সঙ্গে দেখেনি। বললাম—তুমি ভাবছিলে কত টাকা?

—আমি? আমি ভাবছিলাম পঁচিশ ত্রিশ।

—দিতে?

—আমার হার বাঁধা দাও, দিয়ে টাকা আনো।

—থাক, রেখে দাও।

সেদিন দু'টি ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে চাকুরির চেষ্টা করলাম। কোথাও সুবিধে হোল না। সেদিন বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবলাম একটা নির্জ্জন স্থানে বসে।

কিন্তু আসল কাজ হয়ে পড়লো অন্য রকম।

পান্নাও নাচের আসরে বায়না নিতে লাগলো। আমি ওর সঙ্গে সর্ব্বত্র যাই, বাইজির পেছনে সারেঙ্গীওয়ালার মত। পরিচয় দিই দলের রসুইয়ে বামুন বলে, কখনো বলি আমি ওর দূর সম্পর্কের দাদা। এ এক নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা; কত রকমের লোক আছে, কত মতলব নিয়ে লোকে ঘোরে, দেখি, বেশ ভাল লাগে। ওরই রোজগারে সংসার চলে। মাঘ মাসের শেষে কেশবডাঙ্গা বলে বড় একটা গঞ্জের বারোয়ারির আসরে পান্নার সঙ্গে গিয়েছি। বেশ বড় বারোয়ারির আসর, প্রায় হাজার লোক জমেচে আসরে। তার কিছু আগে স্থানীয় এক পল্লীকবির 'ভাব' গান হয়ে গিয়েচে। অনেক লোক জুটেছিল 'ভাব' গান শুনতে। তারা সবাই রয়ে

গেল, পান্নার নাচ দেখতে। কিছুক্ষণ নাচ হবার পরে দেখলাম পান্না সকলকে মুগ্ধ করে ফেলেচে। টাকা সিকি দুয়ানির প্যালাবৃষ্টি হচ্চে ওর ওপরে। গঞ্জের বড় বড় ধনী ব্যবসাদার সামনে সার দিয়ে বসে আছে আসরে। সকলেরই দৃষ্টি ওর দিকে।

আমি বসেছিলাম হারমোনিয়ম বাজিয়ের বাঁ পাশে। আমায় এসে একজন বললে—আপনাকে একটু আসরের বাইরে আসতে হচ্চে—

—কেন?

—ঝড়ুবাবু ডাকচেন?

—কে ঝড়ুবাবু?

—আসুন না বাইরে।

লোকটা আমাকে আসর থেকে কিছুদূরে নিয়ে গেল একটা পুরনো দোতলা বাড়ির মধ্যে। সেখানে গিয়ে দেখি জনকতক লোক বসে মদ খাচ্চে। মদ খাওয়া আমি ঘৃণা করি। আমি চলে আসতে যাচ্চি, ঘরে না ঢুকেই—এমন সময় ওদের মধ্যে একজন বললে—শুনুন মশায়, এদিকে আসুন। আমার সঙ্গের লোকটি বললে—উনিই ঝড়ুবাবু।

ঝড়ু টড়ু আমি মানিনে, অধীর বিরক্তির সঙ্গে বললাম—কি বলচেন?

—আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

—কি কথা?

—ওই মেয়েটির সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ?

—কেন ?

—বলুন না মশাই, আমরা সব বুঝতে পেরেচি।

—ভালোই করেচেন। আমি এখন যাই।

—না না শুনুন। কিছু টাকা রোজগার করবেন ?

—বুঝলাম না আপনাদের কথা।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেচি ওরা কি বলবে। আমি বাইরে যাবার জন্যে দরজার কাছে আসতেই একজন ছুটে এসে আমার সামনে হাত জোড় করে বললে—বেয়াদবি মাপ করবেন।

মদের বোতলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—চলে নিশ্চয়ই ?

আমি রাগের সুরে বললাম—না।

—বেশ, বসুন না ? কত টাকা চাই বলুন, রাগ করচেন কেন ?

ঝড়ুবাবু লোকটি মোটামত, মদ খেয়ে ওর চোখ লাল হয়ে উঠেচে, গলার স্বর জড়িয়ে এসেচে। একটা মোটা তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসেছিল। আমার দিকে চেয়ে বললে—কুড়ি টাকা নেবেন ? পঁচিশ ? ওই মেয়েটিকে চাই।

আমার হাসি পেল ওর কথা শুনে। ও আমাদের ভেবেচে কি ?

আমি কি একটা বলতে যাচ্ছি, আমাকে যে সঙ্গে করে এনেছিল সে বললে—ইনি পল্লীকবি ঝড়ু মল্লিক। ঝড়ু মল্লিকের 'ভাব' শোনেন নি ?

আর একজন পার্শ্বচর লোক বললে—এ জেলার বিখ্যাত লোক। অনেক পয়সা রোজগার। দশে মানে, দশে চেনে।

আমি ভাল করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলাম। এতক্ষণ ওর দিকে তেমন করে চাইনি, ভেবেছিলাম এই গঞ্জের পেট-মোটা ব্যবসাদার। এবার আমার মনে হোল লোকটা সরল প্রকৃতির দিলদরিয়া মেজাজের কবিই বটে।

আমি নমস্কার করে বললাম—আপনিই সেই পল্লীকবি ?

ঝড়ু মল্লিক হেসে বললে—সবাই বলে তাই। এসো ভাই বসো এখানে। কিছু মনে করো না।

—আপনার কথা আমি শুনেচি।

—এসো বসো। এ চলে ?

—আজ্ঞে না, ওসব খাইনে।

ঝড়ু মল্লিক পার্শ্বচরের দিকে চেয়ে বললে—যাও হে, তোমরা একটু বাইরে যাও—আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলি। সবাই চলে গেল। আমার কাছে ঘেঁসে বসে নীচু সুরে বললে—তোমার স্ত্রী ?

—না।

—সে আমি বুঝেচি। কি সম্পর্ক তাও বুঝলাম। আমি একটা কথা জানতে চাই। তুমি ভাই এর মধ্যে কেন ?

—তার মানে ?

—তার মানে তুমি ভদ্রলোক। আমি মানুষ চিনি। এর সঙ্গ ছেড়ে দাও। আমি ভুক্তভোগী, বড় কষ্ট পেয়েচি দাদা। কি করতে ?

—ডাক্তারি।

—সত্যি? কি ডাক্তারি?

—এম্ বি পাশ ডাক্তার।

ঝড়ু মল্লিক সম্ভ্রমের মুখে বলে উঠলো—বসো, ভালো হয়ে বসো। নাম জিজ্ঞেস করতে পারি? না থাক, বলতে হবে না। এখানে কতদিন?

—তা মাস ছ' সাত হয়ে গেল।

—বড় কষ্ট পাবে। আমিই বা তোমাকে কি উপদেশ দিচ্চি? আমি নিজে কি কম ভোগা ভুগেচি? এখনো চোখের নেশা কাটেনি। মেয়েটির নাম কি?

—পান্না।

—বেশ দেখতে। খুব ভালো দেখতে। আমি ওকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েচি। অমন মেয়ে এ রকম খেমটার আসরে বড় একটা দেখা যায় না। আচ্ছা আমি তোমাকে কিছু বলবো না আর ও নিয়ে। তুমি এখন ছাড়তে পারবে না তাও জানি। ও বড় কঠিন নেশা, নাগপাশ রে দাদা। বিস্তর হাবুডুবু খেয়েছি ও নিয়ে। নইলে আজ ঝড়ু মল্লিক সোনার ইট দিয়ে কোটা গাঁথতে পারতো। এ কি রকম মেয়ে? পয়সাখোর?

—না, তার উল্টো। বরং রোজগার করে ও, আমি বসে বসে খাই। পয়সাখোর মেয়ে ও নয়।

মোটামুটি ঝড়ু মল্লিককে সব কথা বললাম। লোকটাকে আমার ভাল লেগেছিল, লোকটা কবি, এতেই আমি

ওকে অন্য চোখে দেখেচি। নইলে এত কথা আমি ওকে বলতাম না।

ঝড়ু মল্লিকের নেশা যেন কেটে গিয়েচে। সব শুনে বললে —এ নিয়ে আমার বেশ ভাবগান তৈরি হয়। আসলে কি জানো ভায়া, ভাবেরই জগৎ। যার মধ্যে ভাবের অভাব, তাকে বলি পশু। এই যে তুমি, তুমি লোকটি কম নয়, নমস্য। যদি বল কেন, তবে বলি। ডাক্তারি ছেড়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে, স্ত্রী পুত্র ছেড়ে ওই এক ষোলো সতেরো বছরের মেয়ের পেছনে পেছনে কেন ঘুরে বেড়াচ্চ তুমি? সর্ব্বস্ব ছেড়ে ওর জন্যে। সবাই কি পারে? তোমার মধ্যে বস্তু আছে। ভায়া, এ সব সবাই বুঝবে না।

আমি নিজের কথা খুব কমই ভেবেছি। এ ক'মাস। চুপ করে রইলাম।

ঝড়ু বললে—এ জন্মে এই আসচে জন্মে এই ভাব দিয়ে তাঁকে পাবে?

—তাঁকে কাকে?

—ভগবানকে।

উত্তরটা যেন তিনি প্রশ্ন করবার সুরে বললেন। আমার বেশ লাগছিল ওর কথা, শুনতে লাগলাম। কবি কিনা বেশ কথা বলতে পারে। তবে বর্ত্তমানে ভগবানের সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই, এই যা কথা।

ঝড়ু আবার বললে—হ্যাঁ ভায়া, মিথ্যে বলচি নে। এই

সব্যবস্ত াগের অভ্যেস ভাবের খাতিরে, এ বড় কম অভ্যেস নয়, পান্না তোমাকে শেখালে। ও না থাকলে শিখতে পেতো না। অন্য লোকে বলবে তোমাকে বোকা, নির্ব্বোধ, খারাপ, অসৎ চরিত্র বলবে তোমায়।

আমি বললাম—বলবে কি বলচে, গ্রামের লোক এতদিন বলতে সুরু করেচে।

—কিন্তু আমার কাছে ও কথা নয়। আমি ভাবের লোক, আমি তোমাকেও অন্য চোখে দেখবো। তুমি ভাবের খাতিরে ত্যাগ করে এসেচ সর্ব্বস্ব, তুমি সাধারণ লোক নও, অন্য মানুষের চেয়ে অনেক বড়। খাঁটি মানুষ ক'টা? জন্তু মানুষই বেশি। পায়ের ধুলো দাও ভায়া—ভাব আছে তোমার মধ্যে—

কথা শেষ না করেই ঝড়ু মদের ঝোঁকে কি ভাবের ঝোঁকে জানিনে, আমার পায়ের ধুলো নিতে এল ঝুঁকে পড়ে। আমি পা সরিয়ে নিয়ে তখনকার মত কবির কাছ থেকে চলে এলাম। মাতালের কাছে বেশিক্ষণ বসে থাকা ভালো নয় দেখচি।

ঝড়ু মল্লিকের কাছ থেকে চলে তো এলাম, কিন্তু ওর কথা আমার মনে লাগলো। নেশায় পড়ে গিয়েছি কথাটা ঠিকই, আমিও তা এক এক সময় বুঝতে পারি।

কিন্তু ঝড়ু মল্লিক কবি যখন, তখন জানে এ নেশার মধ্যে কি গভীর আনন্দ। ছাড়া কি যায়? ছাড়া যায় না। পান্না সেদিন নাচের আসরের পর এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, অনেক রাত—বাইরে চাঁদ উঠেছে, শন্ শন্ করে হাওয়া বইচে—আমি

বাইরের বারান্দায় শুয়েছিলাম—কিন্তু ও বলেছিল আমার কাছে এসে শোবে রাত্তিরে, নয়তো নতুন জায়গা ভয় ভয় করবে। নীলি এবার আসেনি, ও একাই মুজরো করতে এসেচে। ভয় ওর করতেই পারে, তাই রাত্রে আমি ঘরের মধ্যেই এলাম।

পান্না অঘোরে ঘুমুচ্ছে, ওর গলায় সোনার হার। মেয়েমানুষ সত্যিই বড় অসহায়। যে কেউ ওর গলা থেকে হার ছিনিয়ে খুন করে রেখে যেতে পারে এ সব বিদেশ বিভুঁয়ে। আর ওর যখন ওই উপজীবিকা, বাইরে না গিয়ে ওর তখন উপায় নেই। আমি ওকে ফেলে অনায়াসে পালাতে পারি, আমার মহাভিনিষ্ক্রমণ এই মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হতে পারে—কিন্তু তা আমি যাবো না। আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ও আত্মীয় স্বজন ছেড়ে চলে এসেচে, একে আমি অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে পারি?

পান্না আমার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠলো। জড়িত স্বরে বললে—কে?

—আমি।

—শোও নি?

—না। আমি তোমার গলার হার চুরি করবো ভাবছিলাম।

—সত্যি?

—আমি মিথ্যে বলচি?

—বোসো এখানে। হ্যাঁগা, তুমি তা পারো?

—কেন পারবো না। পুরুষ মানুষ সব পারে।

—তোমার মত পুরুষ মানুষে পারে না। শোনো, একবার কি হয়েছিল আমার ছেলেবেলায়। শশীমুখী পিসি ছিল আমাদের পাড়ায়। পরমা সুন্দরী ছিল সে—অমার একটু একটু মনে আছে। তার সঙ্গে অনেক দিন থেকে রামবাবু বলে একটা লোক থাকতো। তার ঘরেই থাকতো, মদ খেতো, বাজার থেকে হিংয়ের কচুরি আনতো। একদিন রাত্রে, সেদিন সেই কালী পূজোয় আমার বেশ মনে আছে—শশীমুখী পিসিকে খুন করে তার সর্ব্বস্ব নিয়ে সেই রামবাবু পালিয়ে গেল। সকালে উঠে ঘরের মধ্যে রক্তগঙ্গা।

—ধরা পড়েছিল ?

—না। কত খোঁজ করা হয়েছিল, কোনো সন্ধান নাকি পাওয়া গেল না।

—তারপর শোনো না। ঘরে একটা ক্লকঘড়ি ছিল, তার মধ্যে শশীপিসি জড়োয়ার হার রাখতো। রামবাবু সেটা জানতো না—তার পরদিন সেই হার বেরুলো ঘড়ির মধ্যে থেকে, পুলিশে নিয়ে গেল। কার জিনিষ কে খেল। আমাদের জীবনটা এ রকম—বুক কাঁপে সব সময়। কখন আছি, কখন নেই। যত পাজি বদমাইস লোক নিয়ে আমাদের চলতে হয়, ভালো লোক ক'টা আসে আমাদের বাড়ি? বুঝতেই পারচো তো।

—অর্থাৎ আমি একজন পাজি লোক ?

—ছি, তোমাকে কি বলচি ? আমি মানুষ চিনি। তোমার কাছে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোনো ভয় থাকে না।

—আমায় বিশ্বাস হয় ?

—বিশ্বাস হয় কি না বলতে পারিনে। তবে তুমি যদি খুন করেও ফেলো, মনে দুঃখ না নিয়েই মরবো। তোমার ছুরি বুকে বিঁধবার সময় ভয় হবে না এতটুকু।

—আচ্ছা, তুমি এখন ঘুমোও, রাত অনেক হোলো আবার কাল তো সকাল সকাল নাচের আসর।

—ঘুমুই আর তুমি আমাকে মেরে ফেলো গলা টিপে, না ?

—তা ইচ্ছে হয় তো গলা টিপে মারবো। ঘুমোও।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি পান্না তখনও অঘোরে ঘুমুচ্চে। আমি উঠে বাইরে গেলাম। একটা কদম গাছ ডালপালা বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সকালের রোদ বাঁকাভাবে গাছটার উপর পড়েচে। গাছটার দৃশ্য আমার মনে এমন এক অপূর্ব্ব ভাব জাগালো, যে আমি প্রায় সেখানে বসে পড়লাম। কি যে আনন্দ মনে, আমার এত বৎসরের অভিজ্ঞতায় কখনো আস্বাদ করিনি। আজ আমি পথের ফকির, পসারওয়ালা 'ডাক্তার' হয়ে খেমটাওয়ালীর সারেঙ্গী নিয়ে বেড়াচ্ছি—কিন্তু আমার মনে কোন কষ্ট নেই, কোন খেদ নেই।

ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালা যে পুরনো দোতলা বাড়িতে থাকে, সেটা একটা পুকুর পাড়ে। সারা রাত ভালো করে ঘুম হয়নি, পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখি ঝড়ু ভাবওয়ালা পুকুরের ওপারে নাইচে।

আমায় দেখে বললে—ডাক্তারবাবু—

—কি বলুন।

—চা খেয়েচেন সকালে ? আসুন দয়া করে আমার আস্তানায়।

—চলুন যাচ্ছি।

লোকটা আমার জন্য খাবার আনিয়েচে বাজার থেকে। খুব খাতির করে বসালে। লোকটাকে আমারও বড় ভাল লেগেচে, এমন দিলদরিয়া ধরণের লোক হঠাৎ বড় দেখা যায় না। সবিনয়ে আমার অনুমতি প্রার্থনা করে (যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না) একটু মদও সে নিজের চায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে। এক চুমুকে চা-টুকু খেয়ে নিয়ে আমায় বললে—চলবে ?

—না। আপনি খান—

—তুমি ভাই নতুন ধরণের মানুষ। আমরা ভাবওয়ালা কিনা, ধরতে পারি। তোমায় নিয়ে ভাব লিখবো কিনা, একটু দেখে নিচ্ছি। তুমি বড় ডাক্তার ছিলে, আজ ভাবের জন্যে সারেঙ্গীওয়ালা সেজেচ—

—তা বলতে পারেন—

—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কিছু মনে কোরো না। মা লক্ষ্মী বর্ত্তমান ?

—হুঁ।

—কোথায় ?

—দেশের বাড়িতে আছেন।

ঝড়ু একটু চুপ করে থেকে বললে—তাই তো। ও কাজটা যে আমার তেমন ভালো লাগচে না। মা লক্ষ্মীকে যে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। ওটা ভেবে ছাখোনি বোধ হয় ভায়া। নতুন

নেশার মাথায় মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—তোমার দোষই বা কি ? আমারও ওইরকম হয়েছিল ভায়া। তবে আমার স্ত্রী নেই, ঘর খালি, হাওয়া বইচে হু হু করে। কাল তোমায় একবার বলেছিলাম যে তুমি স্ত্রীপুত্র ছেড়ে বেড়াচ্চ পান্নার পেছনে, কিন্তু রাত্রে ভাবলাম মা লক্ষ্মী তো নাও থাকতে পারেন ? তাই জিজ্ঞেস করলাম। আমার ব্যাপার শুনবে ? আজ ঝড়ু সোনার ইট দিয়ে বাড়ি গাঁথতে পারতো, তোমাকে বললাম যে—

ঝড়ু একটা লম্বা গল্প ফাঁদলে।

জায়গাটার নাম সোনামুখী, সেখানে বড় আসবে ভাব গাইতে গিয়েছিল ঝড়ু। একজন অগ্রদানী বামুনের বাড়িতে ওর থাকবার বাসা দেওয়া হয়। বাড়িতে ছিল সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী, দুই মেয়ে আর এক বিধবা ভাতৃবধূ। এই বধূটির বয়স তখন কুড়ি একুশ, পরমা সুন্দরী—অন্ততঃ ঝড়ুর চোখে। অনেক রাত্রে ভাবের আসর থেকে ফিরে এলে এই মেয়েটিই তার খাবার নিয়ে আসতো বাইরের ঘরে। ঝড়ু তার দিকে ভাল করে চাইতো না। ঝড়ু ভদ্রলোক, অমন অনেক গেরস্ত বাড়ি তাকে বাসা নিয়ে আসতে হয় কাজের খাতিরে দেশে বিদেশে। গেরস্ত মেয়েরা ভাত বেড়ে দিয়েচে সামনে কখনো উঁচু চোখে চায় নি।

—সেদিন মেয়েটি ডালের বাটি সামনে ঠেলে দিতে গিয়ে আমার হাতে হাত ঠেকলো। বুঝলে ? আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—আহা ! মেয়েটি বললে—গরম ? আমি

বললাম—না সে কথা বলিনি। হঠাৎ আপনার হাতে হাত লাগলো, সেজন্যে আমি বড় দুঃখিত। কিছু মনে করবেন না। ডাল গরম নয়, ঠিকই আছে।

মেয়েটি বললে—আপনি চমৎকার ভাব তৈরী করেন—

আমি বললাম—আপনার ভালো লেগেচে ?

মেয়েটি পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করতে লাগলো আমার গানের। এমন নাকি সে কোথাও শোনে নি। রোজ সে আসরে গিয়ে আমার মুখের দিকে অপলক চোখে নাকি চেয়ে থাকে। তারপর বললে, সে নিজেও গান বাঁধে। আমি চমকে উঠলাম। একজন কবি আর একজন কবি পেলে মনে করে অন্য সব জন্তু মানুষের মধ্যে এ আমার সগোত্র। তাকে বড় ভাল লাগে। আমি সেই মুহূর্ত্তে মেয়েটিকে অন্য চোখে দেখলাম। বললাম—কৈ, কি গান ? দেখাবেন আমায় ? সে লজ্জার হাসি হেসে বললে—সে আপনাকে দেখাবার মত নয়।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখালে। সে দিন নয়, পরের দিন দুপুরবেলা। বাইরের ঘরে শুয়ে বিশ্রাম করচি, বৌটি এসে বললে—ঘুমিয়েচেন ? সেই গান দেখবেন নাকি ?

আমি বললাম—আসুন, আসুন। দেখি—

মেয়েটি একখানা খাতা আমার সামনে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বসে বসে সব গানগুলো মন দিয়ে পড়লাম। বেশ চমৎকার ভাব আছে কোনো কোনো গানের মধ্যে। আসলে

কি জানেন, মেয়েমানুষের লেখা, যা লিখেচে তাই যেন অসাধারণ বলে মনে হোতে লাগলো। আমার মনের রঙে রঙীন হয়ে উঠলো ওর লেখা।

আধঘণ্টা পরে মেয়েটি আবার ফিরে এল।

আবার বললে—ঘুমুচ্চেন?

—না ঘুমুই নি। আসুন—

—দেখলেন?

—হ্যাঁ সব দেখেচি। ভাল লেগেচে। আপনার বেশ ক্ষমতা আছে।

—হ্যাঁ—ছাই!

কেমন একটা অদ্ভুত টানা টানা মধুর ভঙ্গিমার সুরে 'ছাই' কথাটা ও উচ্চারণ করলে। কি মিষ্টি সুর। আমি ওর মুখের দিকে ক্ষণিকের জন্যে চাইলাম। চোখোচোখি হয়ে যেতেই চোখ নামিয়ে নিলাম। তখনও আমি ভদ্রলোক। কিন্তু বেশি-দিন আর ভদ্রতা রাখতে পারলাম না। সে আমার দুর্ব্বলতা। লম্বা গল্প করবার সময় এখন নেই। এক মাসের মধ্যে তাকে নিয়ে পথে বেরুলাম।

—বলেন কি?

—আর কি বলি।

—তারপর?

—তারপর আর কি! তাকে নিয়ে চলে গেলাম নবদ্বীপ। পণ্ডিত-তারণ জায়গা। বহু পণ্ডিত তরে যাচ্চে। জলের মত

পয়সা খরচ হতে লাগলো। তাকে নিয়ে উন্মত্ত, ভাব গাইতে যেতে মনে থাকে না—

—বলুন, বলুন—

আমি নিজের দলের লোক পেয়ে গিয়েছি যেন এতদিন পরে। কি মিষ্টি গল্প। আমার মনের যে অবস্থা, তাতে অন্য গল্প ভাল লাগতো না। লাগতো এই ধরণের গল্প। আমার মন যে স্তরে আছে, তার ওপরের স্তরের কথা যে যতই বলুক, সে জিনিস আমি নেবো কোথা থেকে? আমার মনের স্তরে ঝড়্ মল্লিক ভাবওয়ালা আমার সতীর্থ।

ঝড়্ আমাকে একটা বিড়ি দিতে এলো। আমি বললাম—আমি খাইনে, ধন্যবাদ।

ও বিস্ময়ের সুরে বললে—তুমি কি রকম হে ডাক্তার? মদ খাও না, সিগারেট খাও না, তবে এ দলে নেমেচ কেন? নাঃ, তুমি দেখছি বড় ছেলেমানুষ। বয়েস কত? চল্লিশ? আমার উনপঞ্চাশ। এ পথের রস কবে বুঝতে আরম্ভ করেচ। এর পর বুঝতে পারবে। রসের আস্বাদ যে না জানে, সে মানুষ নয়। রসে আবার স্তর আছে হে, এসব ক্রমে বুঝবে। এই রসই আবার বড় রসে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা রাখে—আমি যে ক'বছর তাকে নিয়ে ঘুরেছিলাম, সেই ক'বছর ভাবের পদ আমার মনে আসতো যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। দিন নেই, রাত নেই, সব সময় ভাবের পদ মনে আসচে, গান বাঁধছি সব সময়, আর দুনিয়া কি রঙীন! সে ক'বছর কি চোখেই

দেখতাম দুনিয়াকে। আকাশ এ আকাশ নয়; গাছপালা এ গাছপালা নয়—আউশ চালের ভাত আর ভিজে ভাত খেয়ে মনে হোত যেন শচীর পায়েস—

—আহা, বেশ লাগচে। বলুন তারপর কি হোল—

—পরের ব্যাপার খুব সংক্ষেপ। সে দেশ বেড়াতে চাইলে, আমিও দেখলাম পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, পরের গলগ্রহ হয়ে পড়েছিল। কখনো কিছু দেখেনি। আমি না দেখালে ওকে দেখাবে কে?

—আপনাকে বেশ ভালবাসতেন তো?

খুব। মেকি জিনিস আমাদের চোখে ধরা পড়ে যায়। তার ভালবাসা না পেলে কি আর নেশা জমতো রে ভায়া?

—তারপর দেশ বেড়ালেন?

—হ্যাঁ। কালনা গিয়েচি, মধুমতী নদীতে নৌকা চড়ে কালীগঞ্জের বাজারে, বারোয়ারির আসরে গিয়েচি—ওদিকে বসিরহাট, টাকী—হাসানাবাদ—জ্যোৎস্নারাতে টাকী বাবুদের বাগান বাড়িতে দু'জনে বেড়িয়েচি তার মনে কোন দুঃখু রাখিনি। কলাকতায় নিয়ে যাবো, সব ঠিকঠাক—এমন সময় ভায়া, আঁসমালির বাজারে গেলাম গান গাইতে। ওকে নিয়ে গেলাম। সেখানে হাটে বড় বান মাছ কিনলাম এক জোড়া রাত্রে সেই মাছ খেয়ে দুইজনেই সকালে ভেদবমি। অনেক কষ্টে আমি বেঁচে উঠলাম, সে দুপুরের পরে মারা গেল। সে কখন গিয়েছে, আমি তা জানি নে, আমার তখন জ্ঞান

নেই। মানে আমার নিজেরই যাবার কথা তা আমার রোগ বালাই নিয়ে সে চলে গেল—বড্ড ভালবাসতো কিনা?

ঝড়ু ভাবওয়ালার চোখ ছুটো চক্‌চক্ করে উঠলো। আমি আর কোন কথা বললাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পরে ঝড়ু বোধ হয় একটু সামলে নিয়ে বললে—পান্নাকে দেখে তার কথা মনে পড়লো, অবিকল ওর মত দেখতে—তাই আমি বলি তোমাকে—কিছু মনে কোরো না ভায়া—

—এখন কি একাই আছেন? ক'বছর আগের কথা তিনি মারা গিয়েছেন?

—ন' বছর যাচ্ছে। না, একা নেই। একা থাকতে পারে আমাদের মত লোক? মিথ্যে সাধুগিরি দেখিয়ে আর কি হবে। আছে একজন, তবে তার মত নয়। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। আর ধরো এখন আমাদের বয়েসও তো হয়েচে? এই বয়েসে আর কি আশা করতে পারি?

বেলা প্রায় দশটা। আমি ঝড়ু মল্লিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় এসে দেখি পান্না কুটনো কুটচে, সেখানে দু'টি মেয়ে বসে আছে ওরই বয়সী। আমায় দেখে মেয়ে দু'টি উঠে চলে গেল। পান্না বললে—বোষ্টমের মেয়ে ওরা, এখানেই বাড়ি। আমি কীর্ত্তন গাই কিনা জিজ্ঞেস করছিল।

—কেন, ঘোমটা ছেড়ে ঢপের দল বাঁধবে নাকি?

—তা নয়, মেয়ে দুটোর, ইচ্ছে নাচ গান শেখে। তা আমি বলে দিইচি গেরস্ত বাড়ির মেয়েদের এখানে যাতায়াত না করাই ভালো। আমরা উচ্ছন্ন গিয়েচি বলে কি সবাই যাবে?

—খুব ভালো করেচ। আচ্ছা, তোমার মনে হয় তুমি উচ্ছন্ন গিয়েচ ?

—বোসো এখানে। মাঝে মাঝে গেরস্ত বাড়ির বৌ ঝি গঙ্গাস্নান কোরতে যেতো, দেখে হিংসে হোত। এখন আমার যেন আর সে রকমটা হয় না !

—না হওয়ার কারণ কী ?

পান্না আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হেসে মুখ নীচু করলে। বললে—চা খাবে না ? খাওনি তো সকালে। না, সে তোমাকে বলা হবে না। শুনে কি হবে ? চা চড়াবো ? খাবার আনিয়ে রেখেচি, দিই।

—না, আমি ঝড়ু ভাবওয়ালার বাসায় চা খাবার খেয়ে এলাম। তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে। সেখানেই এতক্ষণ ছিলাম।

—ওমা, ছাখো দিকি ? আমি কি করে জানবো, আমি তোমার জন্যে গরম জিলিপি আর কচুরি আনিয়ে বসে আছি। খাও খাও—

—তুমিও খাওনি তো ? সে আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি যখন দেখলে এত বেলা হয়ে যাচ্চে, তোমার ভাবা উচিত ছিল আমার চা খাওয়া বাকি নেই। তুমি খাবারও খাওনি, চাও খাওনি নিশ্চয়ই। ছি, নাও চড়াও চা, আমিও খাবো।

ঝড়ু মল্লিক ভাবওয়ালার ওখানে সন্ধ্যায় আমার নিমন্ত্রণ। পান্নাকেও নিয়ে যেতে বলেছিল।

পান্নাকে বললেও কিন্তু ও যেতে চাইলে না। বললে—

মেয়ে মানুষের যেখানে সেখানে যেতে নেই পুরুষের সঙ্গে। তুমি যাও—

হেসে বললাম—এত আবার শিখলে কোথায় পান্না?

—কেন আমি কি মেয়েমানুষ নই ?

—নিশ্চয়ই।

—আমাদের এ সব শিখতে হয় না। এখনি বুঝি।

—বেশ ভাল কথা। যেও না।

—খাবার আমার জন্যে আনবে?

—যদি দেয়।

পান্না হাসতে লাগলো। তখন ও চা ও খাবার খাচ্চে। হাসতে হাসতে বললে—বললাম বলে যেন তুমি সত্যি সত্যি আবার তাদের কাছে খাবার চেয়ে বোসো না—

ঝড়ু মল্লিক বসে আছে ফরাস বিছানো তক্তপোষে। লোকটা সৌখিন মেজাজের। আমায় দেখে বললে—এসো, ভায়া, বোসো। একটা কথা কাল ভাবছিলাম। আমার ভাবের দলে তোমরা দু'জনেই কেন এসো না। বেশ হয় তা হোলে। আমি ভাবের গান লিখবো। তোমার উনি গাইবেন। পছন্দ হয়? আধাআধি বখরা।

—কিসের আধাআধি?

—বায়নার। যা যেখানে পাবো, আর আধাআধি।

—আমি এর কিছুই জানিনে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

—পয়সার জন্যে বলচিনে ভায়া। তোমাদের বড় ভাল

লেগেচে—ওই যে বললাম—ভাব। ওই ভাবেই মরেছি। নয়তো বলছিলাম না সেদিন, ঝড়ু মল্লিক সোনার ইট দিয়ে বাড়ি তৈরী করতে পারতে। পয়সার লালসা আমার নেই।

খাবার অনেক রকম জোগাড় করেছে ঝড়ু। দু'জনের উপযুক্ত খাবার। পান্না কেন এলো না এজন্য বার বার দুঃখ করতে লাগলো খেতে বসে। ও নাকি আমাদের প্রণয়ের ব্যাপার নিয়ে ভাব গান বাঁধবে, আসরে আসরে গাইবে। বললে—ভাই, লজ্জা মান ভয় তিন থাকতে নয়। নেমে পড় ভায়া, আসরে নামতে দোষ কি ?

ঝড়ু মল্লিক অসম্ভব রকমের কম খায় দেখলাম। ওর পাশে খেতে বসলে রীতিমত অপ্রতিভ হতে হয়। খাওয়ার আয়োজন করেছিল প্রচুর, দু'তিন রকমের মাছ, মাংস ঘি ভাত, ডিমের ডালনা, দই, সন্দেশ। ঝড়ু কিন্তু খেল দু' এক হাতা ভাত ও দু টুকরো মাছ ভাজা, একটু দই ও একটা সন্দেশ। সে যা খেলে তা একজন শিশুর খোরাক। আমি বললাম—এত কম খান কেন আপনি ?

—আমি গান বাঁধি, বেশী খেলে মন যবু থবু অলস হয়ে পড়ে। কম খেলে থাকি ভালো। মাছ মাংস আমি কম খাই, তুমি আজ খাবে বলে মাছ মাংস রান্না হয়েচে নয়তো আমি নিরামিষ খাই।

—মদ খান তো এদিকে।

—ওটা কি জানো ভায়া, না খেলে গান বাঁধবার নেশা জমে না। ওটা ছাড়তে পারি কই ?

—আমার ইচ্ছে করে আপনার মত দেশ বিদেশে গান গেয়ে বেড়াই। তবে না পারি বাঁধতে গান, না আছে গানের গলা।

—এর মতন জিনিস আর কিছু নেই রে ভায়া। অনেক কিছু করে দেখলাম—কিন্তু সব চেয়ে বড় আনন্দ পেলাম এই আসরে গান গেয়ে বেড়িয়ে। পয়সাকে পয়সা, মানকে মান। সেই জন্যই তো বললাম—এসো আমার সঙ্গে।

—আমি তো জানেন ডাক্তার মানুষ। আপনাদের মত কবি নই। কোনো ক্ষমতা তো নেই ওদিকে। আমাকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে বিপদে পড়ে যাবেন। তার চেয়ে আমার ডাক্তারির একটা সুবিধে করে দিন না?

—সে জায়গা আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু তোমার ওঁকে নিয়ে কি করবে? ছোট্ট জায়গায় ছোট্ট সমাজে ঘোঁট পাকাবে, তখন দেশ ছাড়তে হবে। বড় সহরে গিয়ে বোসো।

—হাতে পয়য়া নেই। ডিসপেনসারি করতে হোলে এক গাদা টাকা দরকার।

—টাকা আমি যদি দিই? না থাক, এখন কোনো কথা বলো না। ভেবে চিন্তে জবাব দেবে। ওই যে ভাবেই মরেচে ঝড়ু মল্লিক, নইলে সোনার ইট দিয়ে—

পান্না দেখি খেতে বসেচে। রান্না করেচে নিজেই। একটা বাটিতে শুধু ডাল আর কিছুই খাবার নেই। আমি এত রকম ভালমন্দ খেয়ে এলাম, আর ও শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবে?

—শুধু ডাল দিয়ে খাচ্চো কেন পান্না?

—না, আর কাঁকরোল ভাতে।

—মাছ মাংস পেলে না?

—তুমি খাবে না, কে ওসব হাঙ্গামা করে। মেয়েমানুষের খাবার লোভ করতে নেই, জানো?

—লোভের কথা হচ্চে না। মানুষকে খেতে তো হবে, খাটচো এতো—না খেলে শরীর টিকবে?

পান্না হেসে বললে—তোমাকে আর অত টিকটিক করতে হবে না খাওয়া নিয়ে। পুরুষ মানুষের অন্য কাজ আছে, তাই দেখো গে।

—ঝড়ু ভাবওয়ালা কি বলছিল জানো। বলছিল, আমার সঙ্গে এসে যোগ দাও। চলো একটা দল বেঁধে গান গেয়ে বেড়াই।

—আমিও যাবো?

—তুহি না হলে তো দল চলবেই না। তোমাকে নাচতে হবে, ঝড়ুর গান গাইতে হবে। যাবে?

—না। কি দরকার? আমি একা কি রকম পয়সা রোজগার করতে পারি? নাচের দলে যোগ দিয়ে পরের অধীন হয়ে থাকার কি গরজ?

—ঝড়ু বলছিল—ও টাকা দেবে আমার ডিস্‌পেনসারি খুলতে।

—ওতেও যেও না। পরের অধীন হয়ে থাকা।

—তবে কি করে চলবে?

—তুমি নির্ভাবনায় বসে খাও। আমি থাকতে তোমার ভাতের অভাব হোতে দেবো না। তুমি যদি চুপ করেও বসে থাকো তাহলে আমি চালিয়ে যাবো। আমার আয় কত জানো ?

—কত ?

—যদি ঠিক মতো বায়না হয়, আর মাটি, তবে মাসে নব্বই টাকা থেকে একশো টাকা। তোমার ভাবনা কি ? তোমার বাবুগিরির জুতো আমি কিনে দেবো, কাঁচি ধুতি আমি কিনে দেবো—

কাঁকরোল ভাতে দিয়ে ভাত খেতে খেতে পান্না ওর আয় আর ঐশ্বর্য্যের কথা যে ভাবে বর্ণনা করলে তা আমার খুব ভাল লাগলো। ওর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখচি। কাকে আয় বলে—ও কিছু জানে না। একটা অপারেশন কেসে আমি আশি টাকা রোজগার করেছি একটিমাত্র বিকেল বেলাতে। পান্না আমায় ওর আয় দেখাতে আসে। আমার হাসি পায়। আসলে বয়েস ওর কম বলেও বটে আর সামান্যভাবেই ওদের জীবন কেটে এসেচে বলেও বটে, বেশি রোজগার কাকে বলে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই ওর। এর আগেও তা আমি লক্ষ্য করেছি। পান্না হাসতে হাসতে বলেচে—বাবুর এক জোড়া ভালো জুতো চাই বুঝি ? চলো এবার কলকাতায় গিয়ে জুতো কিনে দেবো। কাল সতের টাকা প্যালা পেয়েছি আসরে, জানো ? ভাবনা কি আমাদের ? হি-হি—

ও দেখচি খাঁটি আর্টিষ্ট মানুষ। ঝড়ু ভাবওয়ালা আর ও

একই শ্রেণীর। পান্নাকে এবার যেন ভাল করে বুঝলাম। পান্না সেই ধরণের মেয়ে, যে ভাবের জন্ত সব কিছু ত্যাগ করতে পারে। সংসারের ধার ধারে না, বেশি খোঁজ খবরও না। যা আসে, তাতেই মহা খুসি। ঝড়ু মল্লিকের মত পুরুষ আর ওর মত মেয়েকে সাধারণ লোকের পর্য্যায়ে ফেলাই চলে না। আমার তো ওদের মত ভাব নিয়ে থাকলে চলবে না, আমি খাঁটি বাস্তববাদী। পান্না যাই বলুক, আমাকে ওর কথায় কান দিলে চলবে না।

কেশবডাঙ্গার বারোয়ারির আসরে পান্নার নাচ আরও দু'দিন হোল। ওর নাম রটে গেল চারি ধারে। সবাই ওর নাচ দেখতে চায়। আমায় বারোয়ারি কমিটির লোকেরা ডাক দিলে। একজন ব্যবসাদারের গদিতে ওদের মিটিং বসেচে। আমায় ওরা বললে—ও ঠাকুর মশাই, আপনাদের কর্ত্রীকে বলুন আরও দু'দিন এখানে ওঁর নাচ হবে—একটু কম করে নিতে হবে। সবাই ধরেচে তাই আমাদের নাচ বেশি দিতে হচ্চে। বারোয়ারি ফণ্ডে টাকা নেই।

—কত বলুন?

—ত্রিশ টাকা দু'দিনে।

—আচ্ছা, জিজ্ঞেস করে আসি।

—আপনি যদি করে দিতে পারেন, আপনি দু'টাকা পাবেন।

—আচ্ছা।

হায়রে! আমার হাসি পেল। দু' টাকা। আমার

কম্পাউণ্ডার ঘা ধুতে দু'টাকা ফি চার্জ্জ করতো। পান্নাকে আর কি বলবো, আমি যা করবো তাই হবে। কিন্তু এদের সামনে জানানো উচিত নয় সেটা। আমাকে ওরা দলের রসুইয়ে বামুন বলে জানে, তাই ভালো।

একজন বললে—তা হোলে আপনি চট করে জিজ্ঞেস করে আসুন।

আমি বাইরে আসতেই একজন লোক বললে—একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনাদের কর্ত্রীকে যদি আমরা দু' তিন জনে আমাদের বাগান বাড়িতে নিমন্ত্রণ করি, উনি যাবেন?

—বাগান বাড়ি আছে নাকি আবার এখানে?

—এখানে নয়। এখান থেকে নৌকা করে যেতে হয় এক ভাঁটির পথ—খোড়গাছির সাঁতরা বাবুদের কাছারি বাড়ি। সেখানকার নায়েব মুরলীধর পাকড়াশী কাল আসরে ছিলেন। তিনি বলে পাঠিয়েছেন। উনি কি নেন?

—তা আমাকে এ কথা বলচেন কেন? আমি তো রসুইয়ে বামুন। উনি কি নেবেন না নেবেন সে কথা ওঁকে জিজ্ঞেস করলেই ভাল হয়।

আপনি যা বললেন ঠিকই, তবে কি জানেন আমাদের সাহস হয় না। কলকাতার মেয়েছেলে, আমরা হচ্ছি পাড়াগাঁয়ের লোক, কথা বলতেই সাহসে কুলোয় না। আপনি যদি করে দিতে পারেন, পাঁচ টাকা পাবেন। নায়েববাবু বলে দিয়েচেন।

—আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, আমি এসে বলচি।

পান্নাকে গিয়ে সব কথা খুলে বললাম। পান্না হেসেই খুন।

বললে—চলো বাপু, এখান থেকে আমরা চলে যাই। আমায় বুঝি নীতি পেয়েছে এরা? আর তোমায় বলি, তোমার রাগ হয় না এ সব কথা শুনে? তুমি কি রকম লোক বাপু? 'বারোয়ারিতে নাচের বায়না দু'দিন বেশি হয় হোক, কিন্তু এ সব কি কথা? ছিঃ—

—নাচের বায়না ত্রিশ টাকাতেই রাজি তো?

—সে তুমি যা হয় করবে। আমি কি বুঝি?

—চল্লিশ বলবো?

—বেশি দেয় ভালো।

আমি ফিরে দেখি সাঁতরাবাবুদের নায়েবমহাশয়ের চর সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েচে। তাকে বললাম—হোল না মশাই।

—কেন, কেন? কি হোল?

—উনি কারো বাগান বাড়িতে যান না। ভালো ঘরের মেয়ে।

—তাই নাকি?

—মশাই আমি সব জানি। ওঁর স্বামী আছেন একজন বড় ডাক্তার। নাচ টাচ উনি সখ করে করেন। সে ধরণের মেয়ে নন।

লোকটা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আমার কথা বিশ্বাস করলে কিনা জানিনে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে চলে গেল। বারোয়ারির কমিটির লোকেরা বললে—কি হোল?

—হোল না মশাই।

—কেন? কি হোল বলুন না?

—চল্লিশ টাকার কমে কর্ত্রী রাজী হবেন না।

—তাই দেবো তবে আপনার টাকা পাবেন না। ত্রিশ টাকায় রাজি করালে আপনাকে কিছু দিলেও গায়ে লাগতো না আমাদের।

—না দেন, না দেবেন। আমি চেষ্টা করে করিয়ে তো দিলাম।

কে একজন ওদের মধ্যে বললে—দাও, ঠাকুর মশাইকে কিছু দিয়ে দাও হে—বেচারি আমাদের জন্যে খেটেচে তো—

ওরা আমাকে একটা আধুলি দিলে। পান্নাকে এনে দেখিয়ে বললাম—আমার রোজগার। তোমার জন্য পেলাম।

পান্না খুসি হয়ে বললে—আমি আরও তোমার রোজগারের পথ করিয়ে দেবো দেখো—

হায় পান্না! এত সরলা বলেই তোমায় আমি ছাড়তে পারি নে!

বললাম—সত্যি?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু হ্যাগো একটা কথা বলি—তুমি নিজে রোজগারের কথা ভাবো কেন? ও কথা তোলো কেন? তুমি বার বার ওই কথা আজ ক'দিন ধরে বলচো কেন? তুমি কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও?

ওর গলার সুরে আবেগ ও উৎকণ্ঠার সুস্পষ্ট প্রকাশ আমাকে অবাক করে দিলে। পান্না শুধু সুন্দরী নারী নয়, অদ্ভুত ধরণের রহস্তময়ী, দয়াময়ী, প্রেমময়ী। নারীর মধ্যে এমন আমি ক'টিই বা দেখেছি। আমি হেসে চুপ করে রইলাম।

ও আবার বললে—হ্যাঁ গো, চুপ করে রইলে কেন? বল না গো—

—আমি তো বলিনি।

—তবে ও রকম কথা বলচো কেন আজ ক'দিন থেকে?

পান্না কুমড়ো কুটচে দা দিয়ে। যেখানে যা লোকে দেয়, এখানে কেউ বঁটি দেয়নি ওকে। আমি সেদিকে চাইতেই ও চেয়ে ফেললে।

বললে—কি করি বলো—

—বাসার বঁটিখানা সঙ্গে করে আনলে না কেন?

—হ্যাঁ, একটা ঘর-সংসার আনি সঙ্গে। ফাঁকি দিলে চলবে না বলো, আমি কি তোমাকে কষ্টে রেখেছি? সুখে রাখতে পারচি নে? হ্যাঁ গা সত্য করে বলো। আমি আরও পয়সা রোজগারের চেষ্টা করবো।

—তুমি তা ভাবো কেন পান্না? আমিও তো এ ভাবতে পারি আমার রোজগারে তোমাকে সুখী রাখবো?

—কেন তা তুমি করতে যাবে? আমি কি সাতপাকের বৌ তোমার?

—তার মানে?

—সেখানে তোমাকে সংসার ঘাড়ে নিতেই হবে। এখানে তা নয়। এখানে আমি করবো। তুমি ও সব নিয়ে মাথা ঘামিও না লক্ষ্মীটি। বোলো যখন যা দরকার, আমি চেষ্টা করবো যুগিয়ে দিতে। আমার মাসিক আয় কত বলো দিকি? আমি [illegible] কি এক শো টাকা। দু'টো প্রাণীর খাবার

হালে চলে যাবে। নীলি কত পায় জানো? আমার সঙ্গে তো খাটতো। অমার আদ্ধেক রোজগার ওর। মুজরোর বায়নার আদ্ধেক, আসরের প্যালা যে যা পাবে, ওর ভাগ নেই। আমার প্যালা বেশি, ও বিশেষ পেতো না। কিন্তু কলকাতা সহরে ওরা দুই বোন, বুড়ো মা—চালাচ্চে তো এক রকম ভালোই। আমাকে বলে, তোমার এত রোজগার তুমি গহনা করলে না দু'খানা। আমি বলি আমার গহনাতে লোভ নেই, তোরা করগে যা। নাচটা আরো ভালো করে শেখবার ইচ্ছে। ভাল পশ্চিমে বাইজির কাছে সাকরেদী করতে ইচ্ছে হয়। গহনা-টহনার খেয়াল নেই আমার। তুমি ভেবোনা, তোমকে সুখে রেখে দেবো।

ওকে নিয়ে কলকাতা আসবার দিনটা নৌকোতে ও ট্রেনে ওর কি আমোদ। ছেলেমানুষের মত খুসি। বললে—এবার ক্যাস ভাঙ্গো। খুব মান রেখেছে কি বল?

—তা তো বটে।

—মোট কত টাকা হয়েচে বলো তো?

—যাটষট্টি টাকা স'দশ আনা।

—আর প্যালা?

—সে তুমি জানো।

—একুশ টাকা।

আমার একটু দুষ্টুমি করবার লোভ হোল।

বললাম—সাঁতরা বাবুদের নায়েবের কথা শুনলে আরও অনেক বেশি হোত—

পান্না শুনে মারমুখী হয়ে বললে—ঠিক মাথা কুটবো তোমার পায়ে, অমন কথা যদি বলবে। আমি তেমন নই। ও সব করুক গে নীলি। ছিঃ—

রাণাঘাটে গাড়ি বদলানোর সময় বললে—একটা ফর্দ্দ কর—কলকাতার বাসায় জিনিসপত্র কিনতে হবে—

—কি জিনিস ?

—কি জিনিষ আছে ? মাছুরের ওপর তো শুয়ে থাকা—

—আর ?

—চায়ের ভালো বাসন তুমি কিনে আনবে ভালো দেখে। ফাটা পেয়ালায় চা খেয়ে খেয়ে তোমার অরুচি হয়ে গেল। আর একজোড়া জুতো নেবে না ?

ওকে আনন্দ দেবার জন্যে বললাম—নেবো না ? ভালো দেখে একজোড়া নেবো কিন্তু—

—হি হি—জুতোর নাম শুনে অমনি লোভ হয়েছে। পুরুষ মানুষের ব্যাপার আমি সব জানি।

—কি জানো ?

জুতোর ওপর বড্ড লোভ—

—নাকি ?

—আমি যেন জানিনে আর কি ?

কলকাতায় পৌঁছে তিনবার দিনের মধ্যে যতদূর সম্ভব জিনিসপত্র কেনা কাটা গেল। একজোড়া জুতো কেনবার সময় ও আমার সঙ্গে যেতে চাইলে। আমি সঙ্গে নিয়ে গেলাম না। ওর কষ্টার্জিত টাকায় দামী জুতো কিনতে চাইনে। কিন্তু

ও সঙ্গে আসলে তাই ঠিক কেনাবে। সস্তা দামের একজোড়া খেলো জুতো নিয়ে এসে বললাম—চমৎকার জুতো—এগারো টাকা দাম, তবে আমার এক জানাশুনো লোকের দোকান—

—কত নিলে ?

—এই ধরো পাঁচ টাকা—

—মোটে ?

—জুতো জোড়া ছাখো না কি জিনিস ! আমার জানা শুনো লোক তাই দিয়েছে।

উলটো ধরণের কথা বললাম। এরকম কথা বলা উচিত তখন, যখন ব্যয় বাহুল্য নিয়ে কর্ত্রী অনুযোগ করচেন। পান্না বলে—পছন্দ হয়েচে ? পর তো একবার।

—এখন থাক।

—আমি দেখি, পায় দাও না ? পাম্প স্যু একজোড়া কিনলে না কেন ?

—ও আমি পছন্দ করি না।

—তোমায় মানাতো ভালো।

—এর পরে কিনে দিও—এখন থাক—

—তোমায় সিল্কের জামা কিনে দেবো একটা।

—বাঃ চমৎকার। কবে দেবে ?

আমার যে খুব আগ্রহ হচ্ছে, এটা দেখানোই ঠিক। নয় তো ও মনে কষ্ট পাবে।

পান্না হেসে বললে—বড্ড লোভ হচ্ছে, নয় ? আমি জানি, জানি—

—কি জানো ?

—তোমরা কি চাও, আমি সব জানি—

—নিশ্চয়। দিও কিনে ঠিক কিন্তু—

বাড়িতে তোরঙ্গ বোঝাই আমার কাপড় চোপড়ের কথা মনে পড়লো। সুরবালার যা কাপড় চোপড় আছে, পান্নার তার সিকিও নেই। আমার পয়সা নেই আজ, তাহ'লে পান্নকে মনের মতন সাজাতাম। ও বেচারির কিছুই নেই। আসরে মুজরো করবার কাপড় খান তিনেক আছে। আর আছে কতকগুলো গিল্টি সোনার গহনা। ওর মায়ের দেওয়া এক খানা বেনারসি শাড়ি আছে ওর বাক্সে, কিন্তু সেখানা কখনো পরতে দেখিনি।

মাস তিন চার কেটে গেল।

একদিন বাজার করে বাসায় ফিরে দেখি গুরুতর কাণ্ড। দু তিনটি পুলিশের লোক বাড়িতে। পান্না দেখি ঘরের এক কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ব্যাপার কি ? পুলিশের লোকেরাই বললে। আমায় এখুনি থানায় যেতে হবে। পান্না নাবালিকা, আমি ওকে ওর মায়ের কাছ থেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

পান্নার মা থানায় জানিয়েছিল। এতদিন ধরে পুলিশে খুঁজে নাকি বের করেছে।

এ আবার কি হাঙ্গামায় পড়া গেল।

পান্না বললে, সে নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছে। কোনো কথা টিকলো না। পুলিশে বললে, যদি পান্না সহজে তাদের

সঙ্গে ওর মায়ের কাছে ফিরে যেত রাজি হয়, তবে আমাকে ওরা রেহাই দেবে। ওরা আমাকেই কথাটা বলতে বললে পান্নাকে।

পান্না কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে।

আমি গিয়ে বললাম—পান্না শুনচো সব? কি করবে বলো ফিরে যাও লক্ষ্মীটি—

পান্না আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। কথা বললে না।

আবার বললাম—পুলিশের লোক বেশি সময় দিতে চাইচে না। জবাব দাও। আমার কথা শোনো বাড়ি যাও—

—কেন যাবো?

—নইলে ওরা ছাড়বে না। তুমি নাবালিকা। আমার সঙ্গে নিজের ইচ্ছেয় আসতে পারো না ওরা বলছে।

—তাহ'লে ওরা তোমাকে কিছু বলবে না?

—আমায় বলুক, তার জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই। তোমাকে হয়রানি না করে।

—আমি যাবো, ওদের বলো।

পান্নার মুখ থেকে একথা যেমন বেরুলো, আমি যেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, সত্যি বলচি। এ আমি কখনো আশা করিনি। কেন ও যেতে চাইলো এত সহজে? আমি কখনো ভাবিনি ও একথা বলবে।

আমার গলা থেকে কি যেন একটা নেমে বুক পর্য্যন্ত খালি

হয়ে গেল। ভয়ানক হতাশায় এমনতর দৈহিক অনুভূতি হয় আমি জানি।

আমি ওর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বললাম—বেশ, বেশ তাই বলি—

—কোথায় নিয়ে যাবে ওরা?

—তোমার মায়ের কাছে।

পুলিশের লোকেরা আমার কথা শুনে গাড়ি ডাকলো, ওর জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিলাম, কি-ই বা ছিল! গোটা দুই তোরঙ্গ। নতুন কেনা চায়ের বাসন ওর জিনিসের সঙ্গেই গাড়িতে তুলে দিলাম। বড় আশা করেছিলাম যাবার সময় যখন আসবে, ও কখনো যেতে চাইবে না। ভীষণ কাঁদবে।

পন্না নিঃশব্দে গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

একবার কেবল আমার দিকে একটু একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখে নিলো। তারপর তাড়াতাড়ি খুব হালকা সুরে বললে—চলি।

যেন কিছুই না। পাশের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে, সন্ধ্যের সময় ফিরে আসবে।

চলে গেল পান্না! সত্যিই চলে গেল।

একটা পুলিশের লোক আমায় বললে—মশায়, কি করেন!

রাগের সুরে বললাম—কেন?

—না তাই বলচি। বলচি, মশায়, এবার পেত্নী ঘাড় থেকে নামলো। বুঝে চলুন। আমরা পুলিশের লোক মশায়। কত রকম দেখলাম, তবুও যে যাবার সময় মায়াকান্না কাঁদলো না, এই বাহবা দিচ্ছি, কতদিন ছিল আপনার কাছে?

—সে খোঁজে আপনার কিঁ দরকার ?

বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালাম অন্য দিকে। পুলিশের লোকজন চলে গেল।

আমি কতক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম সামনের জানালাটার দিকে তাকিয়ে।

আমার ভেতরে যেন কিছু নেই, আমি নিজেই নেই।

উঃ পান্না সত্যি চলে গেল ? স্বেচ্ছায় চলে গেল ?

যাকগে। প্রলয় মন্থন করে আমি জয় লাভ করবো। ঘর ভাঙুক, দীপ নিবুক, ঘট গড়াগড়ি যাক। ও সব মেয়ের ওই চরিত্র। কি বোকামি করেছি আমি এতদিন।

সামনের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে এলুম। চা করতে পারতাম, সবই আছে, কিন্তু পেয়ালা পিরিচ নেই, সেগুলো তুলে দিইচি পান্নার গাড়িতে। ওরই জন্যে সখ করে কেনা, ওকেই দিলুম। পুরুষ মানুষের প্রেম অত ঠুনকো নয়, তা'র শক্ত দৃঢ় ভিত্তি আছে। মরুক গে। ও ভাবনাতেই আমার আর দরকার কি ?

যাবার সময় একবার বলে গেল না, বেলা হয়েছে, বাজার করে আনলে ভাত খেও। অথচ—

যাক্—ও চিন্তা চুলোয়।

হোটেল থেকে ভাত খেয়ে এলাম। বাজার থেকে বেছে বেছে মাগুর মাছ কিনে নিয়ে এসেছিলাম দু'জনে খাবো বলে। সেগুলো মরে কাঠ হয়ে গেল। তারপর দেখি বেড়ালে খাচ্ছে।

পাশের বাড়ির শশিপদ সেকরা আমায় ডেকে বললে—ঠাকুর মশায়, তামাক খাবেন ?

—নাঃ।

—বলি, বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল কেন?

—তোমার দেখচি কৌতূহল বেশি।

—রাগ করবেন না ঠাকুর মশাই। আমিও ভালো লোকের ছেলে। অনেক কিছু বুঝি। বলুন না আমারে।

—ও চলে গেল।

—মা ঠাকরুণ?

তারপর শশিপদ সেকরা একটু নিচুস্বরে বললে—সেজন্য মন খারাপ করবেন না আপনি। ওসব অমনি হয়।

—কি হয়?

—ওই রকম ছেড়ে চলে যায়। ও সব মায়াবিনী।

—তুমি এর কি জানো?

আমি অনেক কিছু জানি। ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে। কিন্তু আমি মশায় ঠেকে শিখেছিলাম। সে গল্প একদিন করবো। খাওয়া দাওয়া কি করলেন? হোটেলে? আহা বড্ড কষ্ট গেল। আমায় যদি আগে বলতেন। এখন কি করবেন?

—কি করি ভাবচি।

—উনি কি আবার আসবেন বলে মনে হয়?

—জানি নে।

—রাঁধতে পারেন?

—না।

—তা হোলে তো মুস্কিল। আমার বাড়ি যে খাবেন না,

তাহ'লে আমিই তো ব্যবস্থা করতাম। আমার বাড়িও যশোর জেলায়। দেশের লোক আপনার।

—বেশ বেশ।

সারাদিন পথে ঘুরে ঘুরে কাটলো এক রকম। রাত্রে অনেক দেরি করে বাসায় এলুম। কালও বেড়িয়ে ফিরে এলে পান্না বলেছিল,—একদিন চলো আমরা খড়দ যাবো। মায়ের সঙ্গে একবার ফুলদোল দেখতে গিয়েছিলাম জানলে? বড্ড ভাল লেগেছিল। যাবে একদিন?

—আমি বলেছিলাম চল, সামনের শনিবার।

ও হেসে বলেছিল—আমাদের আবার শনিবার আর রবিবার। তুমি কি আপিসে চাকরি কর!

কিছু না, শশিপদ স্বেকরা ঠিক বলেচে ওরা মায়াবিনী। রাত্রে ঘুমুতে গেলে ঘুম হয় না। হঠাৎ দেখি যে আমি কাঁদচি। সত্যিই কাঁদচি। জীবনে সব কিছু যেন চলে গিয়েছে। আর কোনো আমার ভরসা নেই। কোনো অবলম্বন পর্য্যন্ত নেই জীবনের। পান্না এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? চলেই গেল! আচ্ছা, ও কি আমার ওপর রাগ করে, অভিমান করে চলে গেল? আমি ঘুম ছেড়ে উঠে ভাবতে বসলাম। যদি কেউ আমাকে ওর মনের খবর এনে দিতে পারতো, যদি বলে দিতে পারতো ও অভিমান করে গিয়েছে, আমি তাকে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ করতাম। আমি নিঃস্ব, দেওয়ার কিছুই নেই আমার আজ—নইলে অনেক টাকা দিতাম ওই সংবাদ বাহককে। কিন্তু খবর কেউ নাই বা দিল?

আমি ভেবে দেখলে বুঝতে পারবো নিশ্চয়।

আবার কখন শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি ভাবতে ভাবতে।

স্বপ্ন দেখছি পান্না এসে বলচে—এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম, ওঠো চা করচি, খাও। বা রে—

ধড়মড় করে ঠেলে উঠলাম। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস যেন ফেললাম, ঘুমঘোর জড়িত মন যেন আনন্দে নেচে উঠলো তাহ'লে কিছুই হয়নি, পান্না যায়নি কোথাও। মিথ্যা স্বপ্ন ওর যাওয়াটা।

মূঢ়ের মত শূন্য গৃহের চারিদিকে চাইলাম। কপোতী নীড় ছেড়ে পালিয়েছে। কেউ নেই।

ঘুমিয়ে বেশ ছিলাম। ঘুম ভাঙলেই যেন পাষাণ ভার চাপলো বুকে। সারাদিন এ পাষাণের বোঝা বুক থেকে কেউ নামাতে পারবে না।

এই রকম বিভ্রান্তের মত দিন যে ক'টা কাটলো তার হিসেব রাখিনি।

দিন আসে যায়, রাত্রে ঘুমুই, আর কিছু মনে থাকে না।

একা ঘরে শুয়ে কান্না আসে। বুক—ভাঙা কন্না।

দিনমানে পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ভুলে থাকি। কিন্তু রাত্রে একেবারে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয় শূন্য ঘরে।

আশ্চর্য্যের কথা একটা। পান্না টাকাকড়ি একটাও নিয়ে যায় নি। আমার বালিসের তলায় রেখে গিয়েছে। বোধ হয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গিয়েচে।

আমি তা থেকেই খরচ করছি। নইলে খেতাম কি? নিঃস্ব আমি। কোনো রোজগার নেই।

কলকাতা সহরে মাথা গুজবো কোথায়?

কি হচ্চে কি না হচ্চে, কিভাবে দিন যাচ্চে এ সব দিকে আমার কোন খেয়ালই নেই। যা হয় হবে। কিছু দেখবার দরকার নেই। কি হবে দেখে?

বাড়িওয়ালা ইতিমধ্যে দু'দিন তাগাদা দিয়েও গেল বাড়িভাড়ার।

বললে—আপনি কি বাড়ি রাখবেন?

—দেখি তাই ভাবচি।

—উনি তো রোজগার করতেন। আপনি দলে থাকতেন শুনেচি। আপনার রোজগার নেই এখন, বাড়ির ভাড়া দেবেন কি করে।

—আপনাকে বলবো এই শনিবারে। একটা চাকরির আশ্বাস পেয়েছি।

বেশ। শনিবারে কিন্তু আমাকে যা হয় একটা বলবেন। আমার ভাড়াটে রেডি রয়েচে, শুধু আপনারা অনেকদিন থেকে নিয়ে রখেচেন তাই—

সব মিথ্যে কথা আমার। চাকরির আশ্বাস দিচ্চেই বা কে আর চাকরি খুঁজচেই বা কে? কোনো রকমে দিন কাটা নিয়ে বিষয়। কি খাই কি করি কিছু ঠিক আছে আমার?

আসল কথা অন্য কোনো কথা ভাববার সময় আছে আমার?

শুধু পান্না, পান্না, পান্না।

আর কোনো কথা ভাবতে পারিনে। উপায় নেই। আমি কি তারি? কে যেন ঘাড় ধরে জোর করে ভাবায়। বুকের মধ্যে দিন রাত হু হু করে। গোটা বিশ্বটাই খালি হয়ে গিয়েছে। কেবল কান্না পায়। কত কষ্টে চোখের জল আটকাই। রোজ রাত্রে নির্জ্জন ঘরে অন্ধকারে শুয়ে হাউ হাউ করে কাঁদি। পান্নার বাড়ি আমি জানি। আমি সেখানে যেতে পারি। কিন্তু তা গিয়ে কোন লাভ নেই। যে পান্না আমাকে ছেড়ে এক কথায় গাড়ীতে গিয়ে উঠতে পারে, সে তো সব কিছু মুছে দিয়েই চলে গিয়েছে। আর অত অল্প সময়ের মধ্যে এখুনিতো এত ভালবাসা। পান্নার মন চলে গিয়েছে আমাকে ছেড়ে। তবে কাছে গিয়ে কি করবো আমি।

তবুও মনকে বোঝাতে পারি নি।

আজ দু' তিন দিন থেকে মন যেতে চাইছে পান্নার মায়ের বাড়ি। দেখিনি কতদিন, চোখের দেখা দেখতেও তো পাবো।

আমি কারো ভয় করি না। কে কি বলবে সে ভাবনা আমার নেই। কিন্তু যদি ওকে একটি বার দেখতে পেতুম শুধু চোখের দেখা।

আর আছে একটা উগ্র কৌতূহল, ও কেন চলে এলো কি কি কারণ ও অমন করে চলে আসবার?

এখন পান্নার সম্বন্ধে ওর মনের ভাব কি?

[illegible] দুটো জুড়া [illegible] জুড়ে আমি মরে যাচ্ছি। কি

টাকাই না দিতে পারি এই ছুটো কথা জানবার জন্যে। অবিশ্যি আমি নিঃস্ব, টাকা আমার নেই. থাকলে সব দিয়ে দিতুম।

এতদিনে হয়তো পান্নার অনুতাপ হয়েছে। সে নিশ্চয়ই এতদিনে আমারই মত ভাবচে। আমার কথা রোজ রাত্রে সে ভাবে! হয়তো তার চোখের জল পড়ে। কি ভাবচে সে আমার সম্বন্ধে?

এই খবর পাবার জন্যে মরে যাচ্চি। কে দেবে এ সংবাদ?

একদিন বসে বসে ভাবলুম। কি আশ্চর্য্য আমার এই মনের তীব্র, তীক্ষ্ণ, উগ্র, অতি ব্যগ্র মনোভাব! এমন মন আমার মধ্যে ছিল তা কখনো আমি জানতে পারিনি। এ মন কোথায় এতদিন ঘুমিয়ে ছিল আমারই মধ্যে, সুরবালা এ ঘুম ভাঙাতে পারেনি—ভাঙিয়েচে পান্নার সোনার কাঠি।

এ মন আমাকে একদণ্ড সুস্থির থাকতে দেয় না। সর্ব্বদা পান্নার কথা ভাবায়। সব সময়, প্রতিটি মুহূর্ত্তে। যে যাকে ভালবাসে, সে তার কথা ছাড়া ভাবতে পারে না। ভাববার সামর্থ্য তার থাকে না। আগে বুঝতাম না এ সব কথা। এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, মন নিয়ে এ কারবার তখন আমার ছিল না। দিন রাত, চন্দ্র সূর্য্য, সকাল বিকেল, ইহকাল-পরকাল ভাল, মন্দ—সব নিয়ে সেই এক বিন্দুতে মিশচে—পান্না। যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁদের নাকি এমন দশা হয় শুনেচি। ঈশ্বরের বিষয় ছাড়া ভাবতে পারেন না, ঈশ্বরের কথা ছাড়া কইতে পারেন না। ঈশ্বরের বিরহে [illegible] নাকি বাহ্যজ্ঞান [illegible] হয়ে

যেতেন। বিরহের এ অনুভূতি ভগবান যাকে আস্বাদ করান, সে ভিন্ন করতে পারে না। বিশেষ অবস্থায় পড়তে হয়। সুরবালা বাপের বাড়ি গেলে সে বিরহদশা আসে না। একেবারে হারিয়েচি, এই ভাব আসা চাই। সুরবালা তো কতবার বাপের বাড়ি গিয়েচে, এ দশা কি হয়েচে আমার জীবনে কখনো? তাই বলছিলাম, এখন বুঝছি ইশ্বর ভক্তদের যে তীব্র প্রেমের কথা শুনেচি বা পড়েচি—তা কবি কল্পনা বা অতিরঞ্জিত নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমার চেয়ে হয় তো আরো বেশি সত্য।

মনের ব্যাপারই এই। মনের ঠিক অবস্থায় না পড়লে কি ভেই অন্যের মনের সেই অবস্থা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করা যায় না। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝচি যা, আগে এই সব কথা বললে বিশ্বাস করতাম না। বিশ্বাস হত না। এ সব জিনিস অনুমানের ব্যাপার নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যাপার। আগে থেকে বললে কে বিশ্বাস করবে? পোড় খাওয়া না হোলে পোড়ার জ্বালা কে ধারণা করবে? সাধ্য কি?

ঠিক এই সময় বৌবাজার দিয়ে শেয়ালদ'এর দিকে যাচ্ছি একদিন, উদ্দেশ্য বৈঠকখানার মোড় থেকে এক মালা নারকোল কেনা, হঠাৎ রাস্তার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। [illegible] যাচ্ছে ফুটপথের কোল ঘেঁসে লালবাজার মুখে। সনাতনদাও আমাকে দেখতে পেয়েছে। নইলে আমি পাশ কাটাতুম। আমার পরনে ময়লা জামা, ধুতিও মলিন। প্রায় পয়সার টাকায় কেনা সেই পাঁচটাকা দামের খেলো জুতো জোড়া।

সনাতনদা এগিয়ে এল আমার দিকে। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে এল। যেন বিশ্বাস করতে পারচে না যে আমি

বলি—কি সনাতনদা' যে।

ও বিস্ময়ের সুরে বললে—তুমি।

—হ্যাঁ। ভালো আছো?

সনাতনদা' একবার আমার আপাদ মস্তক চোখ বুলিয়ে নলে। কি দেখলে জানিনে, আমার হাসি পেল। কি দখচ সনাতনদা? ও যেন অবাক মত হয়ে গিয়েচে।

সনাতনদা' এসে আমার হাত ধরলে। আর একবার খর দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—এসো, চলো কোথাও য়ে বসি, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। চলো একটু কো জায়গায়।

বললাম—সুরবালা ভালো আছে? ছেলেপিলেরা?

—চলো। বলচি সব কথা। একটা চায়ের দোকানে নিরিবিলি বসা যাক্—

—চায়ের দোকানে নয় নেবুতলার ছোট্ট পার্কটায় চলো—